আত্মকথন

আমিন আহমদ খান

আত্মকথন | আমিন আহমদ খান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আত্মকথন

আমিন আহমদ খান

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রকাশকাল : ১ জানুয়ারি ২০১৯ ইংরেজি
প্রকাশক : গ্রন্থকার নিজেই
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে : মোহাম্মদ আলী, টাইপোগ্রাফিক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
শুভেচ্ছামূল্য : ১০০/- (একশত টাকা) মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান : সিটি লাইব্রেরি, ডেপুটি বাজার, চুনতি, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বাণী

একজন আধুনিক মানুষের প্রতিকৃতি

রফিকুন নবী

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের প্রায় শেষ প্রান্তে অসংখ্য গাছগাছালিতে আড়াল হয়ে থাকা একান্ত নিরিবিলি বাড়ি। পরম শ্রদ্ধেয় কামাল উদদীন আহমদ খান এবং তাঁর সহধর্মিণী কিংবদন্তি কবি বেগম সুফিয়া কামালের বাসগৃহ এটি। তাঁরা ছিলেন আমাদের সবার খালু-খালা।

আপাতদৃষ্টিতে বাড়িটিকে নিরিবিলি মনে হলেও আসলে সর্বক্ষণ, বলা যায় সকাল-সন্ধ্যা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের, মুক্তচিন্তার আধুনিক মনস্ক, দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত মানুষের আসা-যাওয়ায় মুখর থাকত। নানান সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা তো থাকতই, রাজনীতির কথাবার্তাও' হতো। প্রথিতযশা সংগীতশিল্পীদের আনাগোনা যেমন ছিল, তেমনি ছিল আঁকিয়েদেরও। আমরা কতিপয় ছিলাম শেষোক্তদের দলের। শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী শাহাদাত চৌধুরী (বিচিত্রা সম্পাদক), আবুল বারাক আলভী ও আমি। আমাদের অবস্থানটি ছিল পুরো পরিবারেই ভিন্নতর। দুজনের স্নেহধন্য হওয়ার সুবাদে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের উপস্থিতি ছিল অবধারিত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানান করণীয় দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল নিত্যদিনের আলাপের বিষয়।

ড্রয়িংরুমের পাশেই ছিল খোলা লাউঞ্জ। এ স্থানটির দুদিকের দেয়ালজুড়ে থাকত বইয়ের আলমারি। মাঝখানে অনেকগুলো বেতের চেয়ার। সেগুলোর বেশির ভাগই দখলে থাকত একগাদা বিড়ালের। একটিতে বসে থাকতেন খালু। বই বা পত্রপত্রিকায় নিবিষ্ট চোখ। আমরা ঢুকতেই প্রথমে কুশল জিজ্ঞেস করতেন। তারপর তাঁর ভাবনায় নতুন কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বা বলার কিছু থাকলে বসতে বলতেন। নইলে ড্রয়িংরুমে চলে যেতে বলা ছিল দস্তুর। আসলে আমাদেরও তাঁকে বলার মতো কিছু থাকত না হেতু চোখের আড়াল হওয়ার চেষ্টায় থাকতাম সবাই।

খালুকে এমনিতেই অত্যন্ত গম্ভীর বলে মনে হতো। মনে হতো স্বল্পভাষী। কিন্তু কখনো কখনো তাঁর পছন্দসই বিষয় পেলে মন খুলে কথা বলতেন। বলা

বাহুল্য, ষাটের দশকের পুরো সময়টা ছিল সামরিক শাসন। সেই কারণে নানান দুর্বিপাকে দিনযাপন ছিল অসহনীয়। তাই তো নানামুখী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মহলের মানুষের সংগঠিত হওয়ার সময় অতিবাহিত হওয়া ছিল দস্তুর। খালু সেই সবের কোনো বিষয় পেলে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করতেন। কী পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবকিছু, তা নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। মনে আছে, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় তিনি একদিন বলছিলেন, এক পাকিস্তানের সঙ্গে থাকার সময় ফুরিয়ে আসছে। কলোনি ভাবার জন্য ওদের দিন আর বেশি নেই।

তাঁর এই উক্তি সত্যে রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগেনি। পরবর্তী বছরেই বোঝা গিয়েছিল নির্বাচনের ফলাফল দেখে এবং তার পরের বছর তো যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশই আমরা পেয়ে গেলাম।

১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ করেই আমি গ্রিক সরকারের বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর লেখাপড়ার জন্য এথেন্সে যাওয়ার সুযোগ পাই। ১৯৭৩-এ সেখানে যাওয়ার আগে খালা-খালুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিদেশ নিয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। খালু বলেছিলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার সুফল। সহজেই বিদেশের বৃত্তি পেলে। অতএব উচিত হবে লেখাপড়ায় ভালো করা। দেশের সুনাম বজায় রাখা। নতুন দেশের একজন প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছ, মনে রাখবে, বিদেশিরা কিন্তু অন্য চোখে দেখবে।' তার এই কথার প্রমাণ পেতে দেরি হয়নি। সেখানেও জনগণের মধ্যে অনেকের পাকিস্তানপ্রীতি তখনো অটুট ছিল। অতএব, তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হতো। এসব কারণে। খালুর উপদেশ প্রায়ই মনে হতো।

লেখাপড়া শেষে দেশে ফিরে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম সেই আগের মতোই খালু বই হাতে বসা। একথা-সেকথার পর একপর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জয়নুল আবেদিনের কাজ আমি আমার গ্রিক শিল্পী-অধ্যাপকদের দেখিয়েছিলাম কি না। দেখে থাকলে তাঁরা কী মূল্যায়ন করেছিলেন। কথাটা উঠেছিল আমার কথার পিঠে, বক্তব্য থেকেই। অর্থাৎ, আমি এথেন্সে অধ্যাপকদের বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজের ক্যাটালগ দেখিয়েছিলাম। তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

আমাদের, মানে শিল্পীদের কাছে পেলে তিনি শিল্পকলা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা যেমন করতেন, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রের কাউকে পেলে সেই দিকের ভালো-মন্দ নিয়ে আলাপে বসতেন। রাজনীতিও তা থেকে বাদ থাকত না। কারণ, তিনি প্রচণ্ড রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রশ্রয়ে পুরো বাড়িতেই

রাজনীতির আবহ বিরাজমান ছিল। খালা কবি সুফিয়া কামাল যে দুঃসাহসী ভূমিকা রেখে দেশের সুস্থ সংস্কৃতি, নারীমুক্তি, অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে আধুনিক মনস্ক হওয়ার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পেরেছিলেন, তার পেছনের প্রধান শক্তিটি যে ছিলেন তিনি, এ কথা সহজেই অনুমেয়।

খালু বলেছিলেন, পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেই চিরকাল ব্যস্ত। আমরাও ওদিকেই তাকিয়ে থাকি। সেখানে কী হচ্ছে। কারা কোথায় কী করছে, এই সবকে বিশ্বময় জানান দিয়ে নিজেদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করছে। আমাদের এই প্রাচ্যেও যে চর্চাটা কোনো অংশে কম নয়। বরং নিজ নিজ সাংস্কৃতিক দর্শনকে উপজীব্য করে বিশাল কর্মকাণ্ড রয়েছে। সে দিকটাকে ধর্তব্যজ্ঞান করে না।

শিল্পকলা ও শিল্পীদের তিনি ছিলেন শুভানুধ্যায়ী। শিল্পকলার জগৎ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতেন। কনিষ্ঠ কন্যা সাঈদা কামালকে ছবি আঁকিয়ে বানিয়েছিলেন। ছবি আঁকেন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী কনিষ্ঠ পুত্র সাব্বিরও। এ ক্ষেত্রে দুজনেরই খ্যাতি রয়েছে।

কামাল উদদীন আহমদ খান লেখাপড়া করেছিলেন বিজ্ঞান নিয়ে। বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি নিয়ে লেখালেখি করতেন। উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় সেসব ছাপা হতো। এই লেখার অভ্যাসটি শুরু হয়েছিল যৌবনেই এবং কল্যাণকামী হরেক বিষয়ে লিখতেন। এসবের কারণে তিনি একজন অত্যন্ত আধুনিক প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে গণ্য ছিলেন। তাঁর স্মরণে লেখা আবদুল কাদির সাহেবের একটি বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৯২৭ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের সাপ্তাহিক গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার উল্লেখ করতে গিয়ে কাদির সাহেব লিখেছিলেন, তাঁর গণকল্যাণমুখী প্রগতিশীল চিন্তাধারা আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কাদির সাহেবের লেখাটিতে কামাল খালুর বিষয়ে আরও অনেক উল্লেখ রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি শুধু বিজ্ঞান নিয়ে, শিশুতোষ কবিতা বা গল্প নিয়েই লেখালেখি করেননি, সামাজিক বিষয় নিয়েও লিখতেন। এমনকি ১৩৩৭ সনে জয়তী নামের সাহিত্য গজ পত্রিকায়-অতি-বিবাহ' শিরোনামে একটি একাঙ্কিকাও লোখেন। লেখাটি নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। গল্পের নায়িকা-নায়ক হিন্দু ও মুসলমান। সে আমলে ব্যাপারটি সহজ ছিল না। ধর্মীয় শাসন-অনুশাসনের কঠিনতাকে জেনেও এমন সাহসী অথচ রোমান্টিকতাকে লেখায় প্রশ্রয় দেওয়া সাহসী না হলে সম্ভব ছিল না। প্রচলিত নিয়মের ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় যে কল্লোল গোষ্ঠী সাহিত্য আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন

ধ্যানধারণার অবতারণা করেছিল, তারও অনুসারী ছিলেন। এসবও কাদির সাহেবের লেখায় পাওয়া যায়।

আধুনিক ছাঁচে কবিতাও লিখতেন। শিশুদের জন্য 'পাইড পাইপার অব হ্যামেলিন'এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। হ্যামেলিনের অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা' নামে এবং কাব্যধর্মিতাকে বজায় রেখে।

এত সব গুণাবলি ধারণ করা শ্রদ্ধাজাগানিয়া মানুষটিকে অতি কাছে থেকে দেখেছি। স্নেহাশিস পেয়ে ধন্য হয়েছি। সেই সঙ্গে আমরা নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দেশকে, মানুষকে, নিজের সময়টিকে বুঝতে পারার যে প্রয়োজনীয়তা, সেই উপদেশ আমাদের পাথেয় হয়ে আছে।

চাচা কামাল উদ্দিন আহমদ খান ও চাচী বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে কার্টুনিষ্ট কলামিষ্ট রফিকুন নবীর লেখা থেকে।

নুর জাহান বেগম

মানিক ভাবী

অনেক শূণ্যতার মাঝে অপার আনন্দ খুঁজে পাই। যখনই আমার শ্বশুর বাড়ী চুনতীতে যাই। ছায়া সুনিবীড় শান্তির নীড়, ছোট দেবর (জনু মিঞা) এর অক্লান্ত পরিশ্রমে, নতুন আঙ্গিকে তৈরী করা সুরম্য ডেপুটি বাড়িটি হয়ে ওঠে মনের প্রশান্তির আশ্রয় স্থল। অপার হাসি আনন্দে কেটে যেত কটা দিন। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার এতিহ্যবাহী চুনতী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমীন আহমদ খান (জুনু মিঞার) জন্ম।

পরিবারের সবার ছোট হওয়া সত্বেও তার অসমান্য মানবিক গুণাবলির কারণে আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে "মিঞা" নামে বেশি সমাদৃত।

প্রয়াত স্বামী শফিক আহমদ খান (মানিক) শায়িত আছেন পাহাড়ের উপর মসজিদের পাশে পারিবারিক গোরস্থানে। তিনি সব সময় এই আদরের ভাইটিকে ডাকতেন My Golden brother বলে। আসলেই তিনি Golden hearted একজন মানুষ।

গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার ভূমিকা অসামান্য। প্রচন্ড পরিশ্রমি, সদাহাস্যময়, পরোপকারি মানুষটিকে প্রায় অজাত শত্রু বলা চলে।

তার পরিবারও অত্যন্ত আতিথেয়তাপরায়ন। মেধাবী সন্তানেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সু-প্রতিষ্ঠিত, আমি তাদের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করছি। সবশেষে আমারও Golden brother কে - অশেষ দোয়া, সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রফেসর নিয়াজ আহমদ খান (পিএইচ.ডি.)

প্রাক্তন চেয়ারম্যান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশবিদ্যালয়;
এবং সিনিয়র একাডেমিক এডভাইজর,
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর সেনানিবাস

একটা সীমাবদ্ধতার কথা আগে স্বীকার করে নেই; আমার চাচা জনাব আমিন আহমেদ খানের বিষয়ে আমার লিখা ও মূল্যায়ন খুব নিরপেক্ষ হবে না। তাঁর কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণ অনেক। আমার বাবা (মরহুম ড. শফিক আহমেদ খান)-ও সারা জীবন আমাদের এই ছোট-চাচার উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন, এবং মৃত্যু শয্যায় বাবা তাঁর এই পরম স্নেহের ভাই-কে 'my golden brother' বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। আমার ছাত্রজীবন থেকে পেশাগত জীবন-ব্যাপী ছোট চাচার মমতা, পরামর্শ ও সমর্থন পেয়েছি অকৃপণভাবে; এ'ঋণ একজীবনে শোধ হবার নয়। তথাপি পারিবারিক বলয়ের বাইরেও তাঁর পেশাগত ও সামাজিক দায়বোধ-সংক্রান্ত যে কর্মজগত ও অবদান আছে, আমি এখানে সে প্রসঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ চুকিয়ে দেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা-কেন্দ্রিক সরকারি ব্যাংকে চাকুরী পান কর্মজীবন শুরুর প্রথম চেষ্টাতেই। কিন্তু চাকরিটি তিনি শেষ পর্যন্ত আর করেননি। মাঠের অভিজ্ঞতার সুযোগ আর গ্রাম উন্নয়নের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বরাবরই। সে' নেশা তাঁকে নিয়ে গেলো একটি বিদেশি উন্নয়ন সংস্থার চাকরিতে: সদ্য স্বাধীন আমাদের দেশ তখন গ্রামীণ দারিদ্রসহ আরো অনেক সমস্যায় টালমাটাল। তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রাম এর কক্সবাজার-মহেশখালী উপকূলে দরিদ্র মানুষের- বিশেষত মৎস্যজীবীদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টাতে কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। সদ্যবিবাহিত, চাল-চুলোর ঠিক নেই- এ অবস্থার মধ্যেও তিনি ঢাকার তুলনামুলক আরামের জীবন ছেড়ে পরিবার নিয়ে কক্সবাজার শহরের একচালা এক টিনের ঘরে থাকতেন; আর সাইকেল, মোটসাইকেল আর সাম্পানে পরম আনন্দে ছুটোছুটি করতেন!

স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার মনে আছে, আমি মাঝে মাঝে তাঁর কর্মস্থলে দেখতে যেতাম চাচাকে। তাঁর বড় মেয়েটি তখন সবে জন্ম নিয়েছে টোনা-টুনির সংসারে!

কর্ম-জীবনের প্রথম দিকের মাঠে কাজ করার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়নের প্রায়োগিক বিষয়গুলো খুব কাছ থেকে দেখে প্রাপ্ত শিক্ষা তিনি পরবর্তীতে পেশাগত জীবনের আরো দুটো প্রধান পর্বে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন- যা তাঁর জীবন ও পেশাকে সমৃদ্ধ করেছে বিপুল ভাবে। প্রথম ক্ষেত্রটি হলো গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিকরণ। উনিশশো আশি ও নব্বই দশকজুড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের মানসে 'পথিকৃৎ' নামক একটি উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেন চুনতি'র লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত কিছু কৃতি সন্তান; এই প্রতিষ্ঠানটির সংহতিকরণ ও পরিবর্ধনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন জনাব আমিন আহমেদ খান। প্রায় তিন যুগ ধরে তিনি এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন। সামাজিক বনায়নকে একটি গ্রামীণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'পথিকৃৎ' এর একটি বড় মাপের ভূমিকা আছে। দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রে জনাব খানের অবদান বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো স্থানীয় শিক্ষার প্রসারে। স্কুল, মাদ্রাসা থেকে শুরু করে কলেজ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- যেমন পিছিয়ে-পড়া মেয়েদের জন্য কলেজ- এর পরিচালন ও শিক্ষা কার্যক্রম - দুটোতেই তিনি অবদান রেখেছেন। শিক্ষকতা জীবনের শেষে তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের একসময়ের একমাত্র মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) হিসেবে অবসরে যান। শিক্ষকতায় তিনি প্রায়োগিক জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সমৃদ্ধ করেছেন।

জনাব খানের বহুমূখী ব্যক্তি ও কর্মজীবনের আলোচনা এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়; আমি কতিপয় বিষয়ের উপর সামান্য আলোকপাত করলাম। আমি খুব আনন্দিত যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আমার শেখার আরো একটি সুযোগ তৈরী হলো। ছোট চাচা আমাদের মধ্যে আরো অনেকদিন থাকুন, এবং মমতায় প্রতিনিয়ত আমাদের সিক্ত করুন - এই দো'আ ও কামনা সবসময়।

দীন মুহম্মদ মানিক

চুনতি সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

আমার প্রিয়ভাজন জুনুমিয়া তার 'আত্মকথন' ছাপাতে যাচ্ছে যেনে আমি খুবই আনন্দিত। শুভেচ্ছামূলক কিছু লিখা মানে সমালোচনা নয়। একটু দীর্ঘ মনে হলেও বইটির লেখক সম্বন্ধে (আমার বিবেচনা) প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে শেষ করার আশা রাখি।

আমিন আহমদ খানকে সবাই 'জুনু মিয়া বলেই চিনি এবং এ নামটি সমধিক পরিচিত। তাই লিখাটা এ নামেই শুরু করলাম।

জুনু মিয়া বয়সে আমার কয়েক বছরের ছোট। মারাত্মক অসুখের কারণে আমার শিক্ষাজীবন কয়েক বছর গ্যাপ হওয়ায় ভার্সিটিতে আমরা একই ব্যাচের হয়ে গেলাম। সে সূত্রে আত্মীয়তা ছাড়াও আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম যা এখনো অটুট আছে। নিজের আত্মজীবনী লিখা কঠিন না হলেও পাছে লোকে কিছু বলে'র ভয়ে যোগ্যতার সবটুকু প্রান খুলে লিখা সম্ভব হয় না। হয়তো একারণে অনেকেই আগ্রহী নয়। যা হোক, জুনু মিয়া তার আত্মজীবনী লিখেছে। সুললিত ভাষায় অকপটে প্রায় সবটুকই লিখে গেছে। তাকে যতটুকু জানি, তার 'আত্মকথনে' অতিকথন কিছু পেলাম না। এ বয়সে তার এযাবৎ জীবনের প্রায় সবটুকু লিখে যাওয়া অবাক হয়েছি, হয়েছি মুগ্ধ। ক্ষুরধার লিখনী ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তাকে অভিবাদন।

এবার কিছু আমাদের পরস্পরের স্মৃতিচারণ করতে চাই, শুধু ছাত্রজীবনে নয়, কর্মজীবনেও ভাগ্যক্রমে জীবনের বেশীরভাগ সময় আমরা একসাথে কাটিয়েছি। বিভিন্ন পেশাহেতু প্রথম দিকে কিছুকাল বিচ্ছিন্নভাবে কাটালেও শিক্ষকতা জীবনের শেষভাগে ভাগ্য আমাদের এক জায়গায় এনে দিয়েছিলো এবং সেখান থেকে কিছুকাল আগে-পরে আমরা অবসর গ্রহণ করি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ইং সালের শেষ দিকে এলাকাবাসীর একান্ত আগ্রহে 'এমপিও ভুক্ত' চাকুরী ত্যাগ করে চুনতি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার মানষে আমি লামা মাতামূহুরী কলেজ থেকে নিজগ্রামে চুনতিতে চলে আসি। তখন জুনু মিয়া একই গ্রামে WFP' এর সহায়তায় ও ড. হাফিজের পৃষ্টপোষকতায় বিস্তর এলাকায় বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পথিকৃৎ' নামে একটি এনজিও' প্রতিষ্ঠা করে। বলতে গেলে পথিকৃৎ ও চুনতি মহিলা কলেজ একই সনে (১৯৮৯ইং) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এদিকে জুনু মিয়ার তেমন কোন আর্থিক সমস্যা ছিল না, অন্যদিকে প্রায় শূন্য হাতে আমাকে কলেজের হাল ধরতে হয়েছিল।

জুনু মিয়া ও ড. হাফিজ আমার সমস্যা বুঝতে পারতো। তাই তারা সহানুভূতিশীল হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সহায়তা করে যাচ্ছিলো। আমাকে 'পথিকৃৎ' এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছিলো এবং কলেজের কিছু কর্মচারীকে 'পথিকৃৎ' এর কর্মচারীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সম্মানীভাতা হিসেবে যা পেতাম, তা দিয়ে ঘরের বাজার খরচ প্রায় চলে যেতো। এছাড়াও কলেজের কাজে কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম গেলে যাবতীয় খরচ পথিকৃৎ বহন করতো। বলতে গেলে 'পথিকৃৎ, হয়েছিলো বলেই চুনতি মহিলা কলেজের প্রাথমিক পর্যায়ে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, কলেজের প্রভাষক হিসেবেও জুনুমিয়া প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছিলো। আমি তাকে আমার জায়গায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে 'অফার' দিলে সে সবিনয়ে অপারগতা দেখিয়ে ছিলো। শুধু তাই নয়, শিক্ষক হিসেবে তার প্রাপ্য বেতনও বহুবছর সে কলেজের জন্য উৎসর্গ করেছিল। আমরা একসাথে (যথাক্রমে ১.২০ ও ০.৬০ একর) জমি দান করে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হয়েছিলাম।

তার ধমনীতে পিতৃ পুরুষের শিকারী-রক্ত প্রবাহিত। তাই বর্তমানে চুনতি 'অভয়ারন্যের' একজন সক্রিয় কর্মকর্তা হয়েও শিকারের নেশা ফেলতে পারছিলো না (অবশ্য অভয়ারন্যের বাইরে কোথায়ও)। আমি তাকে শিকার জীবনের কাহিনী নিয়ে একটি বই লিখতে বলবো।

অবসর জীবনে একই গ্রামে থাকলেও ইদানীং আমাদের দেখা হয় কদাচিৎ। জুনু মিয়া ব্যস্ত থাকে তার আবাদী জায়গায় ক্ষেত খামার, বাগান, পশুপালন ইত্যাদি নিয়ে। আর আমি থাকি বার্ধক্ষ্যের নিয়তসমস্যা নিয়ে নিজ বাড়ীতে.....। পাঠ্য জীবনে আমার বিষয় ছিলো ইংরেজি আর জুনু মিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কিন্তু কর্মজীবনে (পথিকৃৎ) ইংরেজি বেশীরভাগ আদান-প্রদান করতে গিয়ে ইংরেজি বিষয়ে তার দক্ষতা আমি মনে করি আমার চেয়েও বেশী।

এক সুগৃহিনী, ৩ ছেলে ও ৫ মেয়ে নিয়ে সুখেই চলছে জুনু মিয়ার সংসার। ছেলেমেয়ে সবাই উচ্চ শিক্ষিত। ছেলেদের মধ্যে বড়জন ব্যাংক কর্মকর্তা, মেঝ ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক, আর ছোটটা একটা ভারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (BSRM) কর্মকর্তা। তৃতীয় মেয়ে চৌকশ পুলিশ অফিসার, তার স্বামী-অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ মেয়ে আমাদের কলেজের ইংরেজি প্রভাষক ছিলো। কিন্তু স্বামী (ডা.) এর কর্মস্থল ঢাকা হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সবাই বিবাহিতা। তাদের স্বামী কেউ পদস্থ কর্মকর্তা, কেউবা বড় ব্যবসায়ী।

আমিন আহমদ খান (জুনু মিয়া) একজন ধার্মিক ব্যক্তি। লেনদেন ও বিশ্বস্ত তায় সত্যি সে একজন 'আল-আমীন। এলাকার বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের

আর্থিক-দায়িত্ব জনগণের ইচ্ছায় পালন করতে হয় তাকে। আমি তাকে মাঝে মধ্যে বলি, I believe you more than me.

তার 'আত্মকথন' অনেক সুন্দর তথ্যে সমৃদ্ধ যা আমাদের অজানা ছিলো। আমি আশাকরি-বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হবেন।

পরিশেষে আমাদের একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলেই আলোচনা শেষ করতে চাই। কর্মজীবনে আমরা একই কাতারে থেকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (চুনতি মহিলা কলেজ) বীজ বপন করেছিলাম। প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম দিকে অনেকে গুরুত্বহীন দৃষ্টিতে দেখলেও বর্তমানে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। এমনকি এলাকার কৃতি সন্তানদের (বিশেষ করে মেজর জেনারেল মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের) আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারি (জাতীয়করণ) হয়েছে। অথচ সুফল ভোগ করতে পারলাম না আমরা দু'জন.....। দুনিয়ার নিয়মটাই এরকম–

কেউ গড়ে যায়,
কেউ চড়ে খায়।

আমাদের মোটেও দুঃখ নেই তাতে। পরম করুনাময় আল্লার কাছে হাজারো শোকরিয়া এজন্যে যে, আমরা জীবদ্দশায় আমাদের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটির সুখবরটা শুনে ও দেখে যেতে পারলাম। বলতে গেলে এটাও মানুষের জীবনে এক বিরল সৌভাগ্য। খোদা হাফেজ।

সুলতানা বদরুন্নেছা (নিশু)

সিনিয়র শিক্ষিকা: হিলভিউ পাবলিক স্কুল, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

আমার আব্বা আমিন আহমদ খানকে নিয়ে বলতে গেলে সবার আগে মনে আসে ওনার কড়া ভাষায় স্নেহমাখা উপদেশ এর কথা। "এখন তুমি আর ছোট নও,ওই বাড়ির বড় বউ। আজ থেকে তোমার অনেক দায়িত্ব। আমি আশা করব, তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে"।

পৃথিবীতে কয়জন বাবা তার ১৫বছর এর মেয়েকে বিয়ের পরের দিন পাহাড়সম উপদেশ এর বোঝা তুলে দিতে পেরেছেন, আমার জানা নেই। সেদিন হৈমন্তির বাবা আর আমার বাবার মাঝে সাদৃশ্য অনুভব করেছিলাম। "বজ্রের ন্যায় কঠোর, আবার বরফের ন্যায় শীতল"-ইনি'ই আমার বাবা।

১৯৯০-২০১৮; পেরিয়ে এলাম আঠাশ'টি বৎসর। জ্ঞান-বুদ্ধি হয়ে বাবার বাড়িতে অবস্থান আমার হয়ত আমার পাঁচটি বছর ও হয়ে উঠেনি। কিন্তু এই কয়দিন এ কঠোর নীতিবান বাবা, আর সহজ-সরল মায়ের যে শিক্ষা অর্জন করেছি তা অবলম্বন করেই এখনও পর্যন্ত সবার স্নেহ এবং ভালবাসার পাত্রী হয়ে আছি।

বাবার আত্মজীবনী প্রকাশিত হওয়া, বড় মেয়ে হিসেবে আমার কাছে পরম সুখের অনুভুতি; চরম গৌরবের বিষয়। জীবনের সিংহভাগ সময় যে মানুষটি অকাতরে বিলিয়ে গেছেন অপরের কল্যাণ সাধনে; দেখিয়েছেন বিশ্বস্ততার, নিষ্ঠার এবং সময়ানুবর্তীতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তার এই লেখা আগামী প্রজন্মের জন্যে একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহান রাব্বুল আলামীন যেন আরো অনেক অনেক বছর বাবা'র স্নেহের ছায়ায় থাকার মত আমাদের তৌফিক দান করেন। বাবার সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মুসা রেজা সিদ্দিকী

সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক: পাইওনিয়ার ইস্যুরেন্স কোঃ লিঃ, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধেয় মামা জনাব আমিন আহমদ খান, আত্মজীবনী প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি। ওনার মত একজন মহান ব্যক্তিত্বের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। আমি মনে করি এই আত্মজীবনী থেকে অনেক কিছুই জানার সুযোগ হবে আমাদের।

মামা আমাকে খুব আদর করেন। আমি একদিকে ওনার বোনের ছেলে, আবার বড় মেয়ের জামাতা। সব মিলিয়ে মামার সাথে সম্পর্কটা অন্যরকম।

উনি একদিকে যেমন সফল অভিভাবক, শিক্ষক ও এনজিও কর্মকর্তা, অন্যদিকে আবার সমাজের একজন সফল নেতাও। মামার জীবনের অসংখ্য প্রাপ্তি রয়েছে। চুনতি ওয়াইল্ডলাইফ সেংকচুয়ারীতে কাজ করে মামা অর্জন করেছেন "ইউএন ইকুয়েটর প্রাইজ"।

"পথিকৃৎ" এনজিও এর মাধ্যমে গ্রামের বেকার লোকদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য সাফল্য দেখিয়েছেন মামা। বনায়নের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। মামা একজন সফল ব্যক্তিত্ব। আমাদের সমাজের কাছে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

আমি মামার দীর্ঘজীবন ও সুস্থতা কামনা করছি।

আমার বাবা এবং তার প্রিয় চুনতি গ্রাম

তাহামিনা সুলতানা

প্রোগ্রাম অফিসার: বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন
২৭০/বি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা তেজগাঁও, ঢাকা।

আমার বাবা আমিন আহমেদ খান, যার ৮(আট) সন্তানের মধ্যে আমি ২য়। যৌথ পরিবার না হলেও আমাদের পরিবার ছিল ১০ সদস্যের একটি বড় পরিবার। পরিবারের সদস্য ছাড়াও আমরা চাচা, মামা, খালা, ফুফুদের সান্নিধ্যে বড় হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছে শিখেছি কিভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে রাখতে হয়। পরিবারে খুব বেশী স্বচ্ছলতা না থাকলেও সবসময় আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতি ছিল। এভাবেই সবাইকে নিয়ে উৎসব আনন্দের মধ্যে আমাদের বড় হওয়া।

একটি গ্রাম একটি স্বপ্নের নাম। বাবার চোখে স্বপ্ন দেখেছি চুনতি গ্রামকে আরো সমৃদ্ধ করার। চুনতিকে বাদ দিয়ে বাবা কখনো কিছু ভাবতে পারেননি। বাবার এই স্বপ্ন এবং বাস্তবের পৃথিবীতে পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ থাকলেও চুনতি গ্রামের মেহনতি মানুষের মধ্যে স্বচ্ছলতা এনে দেওয়াই যেন ছিল আমার বাবার দায়িত্ব। একটা মানুষ তার গ্রামের জন্য গ্রামের মানুষের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতে পারে তা শুধু বাবার মাঝেই দেখেছি।

মায়ের কাছে অভিযোগ শুনেছি চুনতিতে থাকার জন্য আমার বাবা তার চাকুরী জীবনের অনেক সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। যদিও আমার কাছে আমার বাবা একজন সফল মানুষ, যা আমি দেখেছি আমার বাবার প্রতি চুনতি গ্রামের মানুষের ভালবাসার মধ্যে, বৃক্ষরোপণ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে, মহিলাদেরকে কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনার মধ্যে, সর্বোপরি গ্রামের সবুজায়ন বৃদ্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে।

সবশেষে এই দোয়া রইল বেঁচে থাকুক চুনতি গ্রাম, বেঁচে থাকুক আমার বাবা সবার মাঝে হাজার বছর।

শাকিলা সুলতানা

উপ-পুলিশ কমিশনার, বিসিএস পুলিশ (২৫তম ব্যাচ)

তোমারি গৃহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে। অবারিত স্নেহ ও ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব আমিন আহমদ খান। সাত ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে উনার অবস্থান ১২(বার) তম। কিন্তু উনার অগ্রজ ও অনুজ সকলের প্রতি উনার ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ আমাকে সবসময় প্রেরনা জোগায় কিভাবে ছোট হয়েও বড়দের মতো অবস্থান সংসারে তৈরী করা যায়।

শুরু করেছি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে, এখন শীর্ষেন্দুর আশ্রয় নিয়ে বলছি "সব মানুষ সংসারের জন্য জন্মায় না, কেউ কেউ জন্মায় বিশ্বসংসারের জন্য। আমার মায়ের সারাজীবনের শহরে থাকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খকে উপেক্ষা করে আমাদের অধিকতর সুন্দর ভবিষ্যতের আকাঙ্খাকে ম্লান করে দিয়ে তিনি তার নিজস্ব ভালোবাসাকেই গুরুত্ব দিয়ে গেছেন আজীবন। আমার পিতার সেই ভালোবাসার জায়গা "চুনতি"। আমার জানামতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন চুনতির অনেকেই, কিন্তু চুনতিকে নিজের ও সন্তানদের একমাত্র নিবাস হিসাবে কেউই গড়ে তোলেননি। এক্ষেত্রে আমার বাবাই একমাত্র ব্যতিক্রম। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন প্রায় প্রতিবার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচনে আমার বাবা দাড়াবেন এই অজানা আশঙ্কায় আমরা কুকড়ে যেতাম। ইউপি নির্বাচন মানেই আমাদের ধারণা ছিল, ভোট ও ব্যালট বাক্স নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং পরিনতিতে শক্তি প্রদর্শন। কিন্তু আমাদের সকলকে নিশ্চিন্ত করে বাবা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে সরে দাড়াতেন। জনপ্রতিনিধি হওয়ার আকাঙ্খা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্তরালে থেকে মানুষকে সেবা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার রহস্য কি তা একমাত্র আমার বাবাই বলতে পারবেন।

আমরা পাঁচ বোন তিন ভাই, পরিবারে আমার অবস্থান তৃতীয়। নিঃসন্দেহে প্রথম দুই কন্যা সন্তানের পর আমার কন্যা হয়ে জন্মানোটা মোটেই আকাঙ্খিত ছিল না। তথাপি আমার মা সবসময় স্বপ্ন দেখতেন আমরা বড় হবো, অনেক বড়ো। আমার পিতার, আমাদেরকে নিয়ে কোন উচ্চাশা ছিল না। আমার বাবারকাছে সবসময় বড়ো ছিল, আমার চাচতো ভাই-বোনেরা। বাবা তাদেরকে নিয়ে গর্ব করতেন। একেকজনকে নিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। আমাদের রেজাল্ট খারাপ হলে তিনি ভাবলেশহীন থাকতেন। আমাদেরও ধারণা ছিল

আমাদের রেজাল্ট ভালো-খারাপ কোনটা নিয়েই তিনি চিন্তিত নন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে আমার বড় আপার বিয়ে হল। ১৯ বছর বয়সে মেজ আপার। দুজনেরই অনেক ভালো ফ্যামেলি যৌথ পরিবার। আমি সেজ হওয়াতে ওদের দুজনের সংসার তখন কাছে থেকে দেখেছি। অতো অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় দুজনেই সংসার সামলাতে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু আমার বাবার কড়া নির্দেশ ছিল "সংসারেই তোমাকে জয়ী হতে হবে , কোন বিকল্প নেই "। আমি বিকল্প কোন পথ খুজছিলাম, আমার পক্ষে ওদের মত সংসারে জয়ী হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই ভাবলাম পড়াশুনাই বিকল্প। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি কম পরীক্ষায় যখন আমি প্রথম শ্রেণীতে ৪র্থ স্থান ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম হলাম, ছোট মামাই প্রথম এসে খবর দিলেন। বাবা বললেন, মনে হয় ভুল দেখেছো, কিন্তু পরের দিন জনকণ্ঠ পত্রিকায় যখন আমার নাম ছাপা হলো, বাবাতো আনন্দ ধরেই রাখতে পারলেন না। গরু জবাই করে সকল আত্মীয়-স্বজনকে খাইয়ে ছিলেন। যেখানে আমার বাবা কখনোই আমাদের কাছে কিছু আশা করতেন না সেখানে তার আনন্দ দেখে আমার হিসাব মিলছিল না।মনে মনে বুঝলাম সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসার প্রকাশ সবসময় একরকম হয় না।

আমার বাবার কারণেই আমাদের গ্রামের বাড়ি এখনো আনন্দে ভরপুর। আমরা সব বোনেরা দলবেধে গ্রামের বাড়ি যাই। ৭২ বছর বয়সে আমার বাবা আমাদের জন্য বাজারে যান। আমার মা এখনো রান্না করেন, প্রতিবেলায় আমাদের জন্য থাকে বিশাল আয়োজন। শহরের ব্যস্ত জীবনে আমি অনেক বয়স্ক পিতা-মাতা কে দেখেছি যারা নিরানন্দ জীবন কাটান। তাদের ছেলে-মেয়েরা তাদের পাশে থাকে না। অর্থ অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়। প্রচুর অর্থ না থাকার পরেও আমার পিতা সবসময় রাজকীয় জীবন-যাপন করেন। ছেলে-মেয়েদের উপর তিনি নির্ভরশীল নন। আমাদের বড় বউ তার শ্বশুড়ের প্রসঙ্গ আসলেই আবেগে কেঁদে ফেলে। সংসারে সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠিতে আমার বাবার মতো সফল বাবা কয়জন হতে পেরেছে ?

কাজি শহিদুল ইসলাম

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

চট্টগ্রামের সর্বদক্ষিণে সবুজ বনানী ঘেরা সুফি সাধক ও জ্ঞাণী গুনি জনের পূণ্যভূমি লোহাগাড়া উপজেলার স্বনামধন্য ইউনিয়ন চুনতি। এই গ্রামেরই বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আমার শ্বশুর জনাব আমীন আহমেদ খান। পিতামহ জনাব কবির উদ্দিন আহমেদ খান ছিলেন তৎকালীন বৃটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার দাদা ও ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। সে সুবাদে তাদের পরিবার ডেপুটি পরিবার হিসেবেই অত্রএলাকায় এমনকি চট্টগ্রাম অঞ্চলে সু-পরিচিত। এই পরিবারে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা অনেকেই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। আমার শ্বশুর পরিবারে সবার ছোট। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশবিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও পরবর্তিতে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি অর্জন করলেও কোন প্রলোভন বা উচ্চভিলাশী জীবনযাত্রা তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, শেকড়ের টানে গ্রামেই থেকে যান। আমার শ্বশুর আমার দেখা একজন আলোকিত মানুষ, একজন শিক্ষানুরাগী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি। যুগে যুগে কিছু মানুষ আছেন যারা সমাজের আড়ালে থেকে মানুষের মননে ও জ্ঞানে আলোক শিখা প্রজ্জ্বলন ও মানব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন, নির্মোহ চিত্তে জনাব আমিন আহমেদ খান তাদেরই একজন। তিনি জানতেন সমাজের অন্ধকার দূরীভূত করে আলোর প্রস্ফুটন ঘটাতে হলে শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নেই। তিনি চুনতি মহিলা কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, এটি চুনতি সরকারি মহিলা কলেজ হিসেবে পরিচিত। শুধু তাই নয়, পরিবেশ ও সমাজ সচেতন আমার শ্বশুর গড়ে তোলেন পথিকৃৎ নামের একটি সামাজিক সংগঠন। যেখানে নার্সারী, plantation, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হতো। উনার নেতৃত্বে সবুজ বনায়নে পথিকৃৎ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র পূণরুদ্ধার, সুরক্ষা, বণ্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত চুনতি অভয়ারণ্য এর ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ ১০ বছর। তার নেতৃত্বে অত্র এলাকা সবুজায়ন ও বণ্য প্রাণীর অবাধ বিচরনের ক্ষেত্র ভূমিতে পরিনত হয়েছে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে UNDP কর্তৃক UN ইকুয়েটর পুরস্কার লাভ করেন। এরকম আরও অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে সমাজ বিনির্মান ও উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন জনাব আমিন আহমেদ খান। ব্যক্তি জীবনে তিনি পাঁচ কন্য ও তিন পুত্র সন্তানের জনক। সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তার সেজোকন্য (আমার সহধর্মিনী) বাংলাদেশ পুলিশের একজন পুলিশ সুপার। অত্র অঞ্চলের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র, আলোর দিশারী, সমাজ উন্নয়নের অগ্রনায়ক জনাব আমিন আহমেদ খান, আমার শ্বশুর আমাদের মাঝে আরও দীর্ঘ দিন বেচে থাকুক এটাই সবার কাম্য।

সুহানা সুলতানা

(বিএ, অনার্স, এম এ ইংরেজী)

আব্বাকে নিয়ে যখনই লিখতে যাচ্ছি -মনে পড়ে যাচ্ছে শৈশব, কৈশোর বেলার হাজারো স্মৃতি। শুরুটা যে কি দিয়ে করবো-- বুঝতেই পারছি না। আট ভাই বোনের মধ্যে আব্বা মনে হয় আমাকে একটু বেশীই আদর করতেন--এ ব্যাপারে অন্যদের অভিযোগও আছে। সেই সুবাদে আব্বার কাছাকাছি থাকতামও বেশি। আমার অতি কর্মব্যস্ত বাবাকে আমি কখনো আলসেমি করতে দেখিনি। গৃহস্থালি সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে নানা ধরনের সমাজকল্যাণ মূলক কাজে আব্বার ব্যস্ততার কোন শেষ ছিল না। দিনের শুরু থেকেই আব্বার কাছে বিভিন্ন বয়সের লোক আসতো বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ নিয়ে; আবার অন্য সময় নিজেই যেতেন কত জায়গায়। এলাকার ইশকুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সভা, সমাবেশ, বিবাহ-শাদী সকলের আবদার রক্ষা করতেন তিনি অকপটে।

কখনো তাকে দেখেছি খামারবাড়ীতে কৃষকদের সাথে কাজ করতে গিয়ে পায়ে জোকেঁ খাওয়া রক্ত নিয়ে বাসায় ফিরেছেন, কখনো-বাড়ীর পুকুরের ময়লা পরিষ্কার করছেন, কখনোবা গাভীর দুধ দোহন করছেন--আবার আমার এই অতি সাধারণ বাবাই আমাদের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠতেন যখন তিনি আমাদের বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণগুলো শিখিয়ে দিতেন; আবার ইংরেজি সাহিত্যের দুর্বোধ্য গল্প-কবিতাগুলো সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন।

আব্বা যখন মাদ্রাসায় ইংরেজির ক্লাস নিতেন তখন একটু লোভ করেই আব্বাকে বলেছিলাম -- আমি মাদ্রাসায়ই ভর্তি হবো। টিফিনের সময় অফিসে গেলেই আব্বা আমাকে দু থেকে পাচঁ টাকা দিতেন। আমার এই স্নেহশীল বাবাকে কখনো। দেখেছি -- মাধ্যমিক স্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক সংকটে; কখনো দেখেছি চুনতি মহিলা কলেজের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

আব্বার সুবাদে আমরা অনেক গণ্যমান্য মানুষের সান্নিধ্য ছোটবেলা থেকেই পেয়ে আসছি।

আমার নিঃস্বার্থ, সহজ সরল বাবার সরলতা দেখতাম -যখন এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাবার সাথে নানা খুনসুটিতে মেতে উঠতো।

আমাদের মানুষ করার জন্য -আব্বা প্রয়োজনে অনেক কঠোরও হয়েছেন। এই শৃঙ্খলাপূর্ণ, কঠোর অবয়বটার ভেতরে বাস করে অতি সাধারণ, নির্লোভ, শিশুসুলভ এক মহৎ ব্যক্তিত্ব।

আব্বার কাছে একদিন প্রশ্ন রেখেছিলাম--- ঢাকা বিশবিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে জীবনটা এই গ্রামেই পার করে দিলেন, কত কিছুই তো হতে পারতেনঃ আপনি কি এখন সন্তুষ্ট?

একরাশ তৃপ্তি নিয়ে আব্বা আমাকে জবাব দিলেন-- মহান আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া ; তিনি আমাকে অনেক দিয়েছেন।

আমি আমার আব্বার কাছে সর্বোত্তম শিক্ষাটাই পেয়ে গেলাম--সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

আব্বা যে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন-- এতে আমি অত্যন্ত খুশী। এর মাধ্যমে আমরা আব্বার অনেক না বলা কথা জানবো, আমাদের ছেলেমেয়েরাও জানবে। আল্লাহ আব্বাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন, আমীন।

ডা. আসগর কামাল

(বি.সি.এস. স্বাস্থ্য)

জনাব আমিন আহমেদ খাঁন, আমার মামা, চুনতির এক জীবন্ত কিংবদন্তি। দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে ও এই গাঁয়ের মানুষকে ভালোবেসে তিনি এখানেই বসত গড়েছেন। নিভৃতচারী এই ব্যক্তি চুনতি, চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক বনায়নের যে প্রাণপুরুষ তা বোধকরি তাঁর নিজ গাঁয়ের মানুষেরই অজানা। সহজ, সরল, নির্লোভ, সদালাপী, নিস্বার্থ, পরোপকারী সকল বিশেষণ এই গাঁয়ে শুধুই তারই জন্য প্রযোজ্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সকল ক্ষেত্রে এই গাঁয়ের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি চুনতি নামটিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিয়ে আসেন "Chunati Comanagement Committee" গঠনের মাধ্যমে। তারই সভাপতিত্বে চুনতি অভয়ারণ্য UN ইকুয়েটর পুরস্কার লাভ করে যা তাঁরই শ্যালক জনাব আনোয়ার কামাল তাঁর পক্ষে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে ভাগ্নে ও জামাই হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, আমি গর্বিত হই। অত্যন্ত উচ্চ বংশোদ্ভূত কিন্তু বিনয়ী এই ব্যক্তির দ্বারা কোনোনা কোনোভাবে উপকৃত হননি এমন ব্যক্তি এই গাঁয়ে তাঁর শত্রুও নেই। তাঁর সান্নিধ্য পাবার আশায় আমি প্রায়শই চুনতি ছুটে আসি। দোয়া করি আরো অনেক অনেকদিন আমাদের মাঝে থেকে তিনি আলো বিতরণ করবেন, তাঁর স্নেহের ছায়ায় আমাদের ধন্য করবেন। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত তাঁর এই আত্মকথন সকলের জন্য আলোকবর্তিকা হোক এই কামনায়। (ডা. আসগর কামাল সিদ্দিকী, ভাগ্নে ও জামাতা)।

আবরার আহমদ খান

[প্রথম পুত্র+ ও ৫ম সন্তান]
সিনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং মহান মানুষের জন্য লিখতে বসে নিজেকে অনেক গর্বিতবোধ করছি। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমিন আহমদ খান যিনি সকলের কাছে জুনু মিয়া নামে পরিচিত। তিনি আরেক মহান ব্যক্তিত্ব মরহুম ডেপুটি কবির উদ্দিন আহমদ খানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, আব্বার দু'একটি কথা আমার সবসময় মনে পড়ে তাহলো, আব্বা কোনদিন আমাদের অন্যায় আবদারে প্রশ্রয় দেননি। সবসময় তিনি নিজের সন্তানদের শুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন এবং আমরা ছোটবেলায় কোন অপরাধ বা দুষ্টুমি করলে তিনি প্রথমেই আমাদের কথা বলতেন। আব্বা কখনও অন্যায়ভাবে নিজের সন্তানদের অপরাধের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেননি। যার ফলে আমরা নিজেরা অনেক সচেতন হয়েছি এবং নিজেদেরকে বুঝতে শিখেছি।

আর যে কথাটি আমার খুব বেশি মনে পড়ে তা হলো,আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি তখন আমার পরীক্ষার হলে যাওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্ট দরকার হলো, তখন আমাদের বাড়িতে গাড়ি থাকা সত্বেও আব্বা আমাকে বন্ধুদের সাথে সিএনজিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তখন আমি বুঝতে পারলাম আমার বন্ধুরা মনে কষ্ট পাবে বলে আব্বা এই কাজটি করেছেন এবং এটিও বুঝতে পারলাম এই মহৎ মানুষটি থেকে অনেক কিছু শিখার আছে।

আব্বার আত্মজীবনী মুলক গ্রন্থ "আত্মকথন" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও শিহরিত। ইতিমধ্যে আমার ভাই বোনেরা সুন্দরভাবে তাদের লিখনি উপস্থাপন করেছে তাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। নিঃসন্দেহে "আত্মকথন" জীবনী গ্রন্থে আব্বার বর্ণাঢ্য জীবনের। বিভিন্ন দিক স্পষ্ট উঠে এসেছে।

আমি মনে করি, আব্বার এই লেখনি আমার ছেলেমেয়ে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা ও উন্নতির সোপান হয়ে থাকবে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জত "আব্বাকে অনেক দীর্ঘ হায়াত দান করুন" আমীন।

সামিহা সাদেকা

এমএসএস- মাদ্রাসা শিক্ষক

আব্বার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "আত্মকথন" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমার মনে হলো আমারও কিছু একটা লেখা দরকার।

আমি শ্রদ্ধেয় আমিন আহমদ খানের বড় পুত্রবধু। আব্বা আমাকে আদর করে বৌমাতা ডাকেন। খুব শখ করে আমাকে ঘরে এনেছিলেন। বর্তমান সমাজে সবদিকে যৌতুকের ছড়াছড়িকে পাশ কাটিয়ে আব্বা আমাকে ঘরে পুত্রবধু করে এনেছিলেন। প্রথম প্রথম আম্মাজান ডাকতেন। আলিম পাশ করার পর আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকমাস পরে আমি জানিও না আব্বা আমার মাদরাসা থেকে সার্টিফিকেট তুলে এনে আমাকে চুনতি মহিলা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কলেজের বইসব এনে দিয়েছিলেন আমার স্বপ্ন ছিল কলেজে পড়ার আব্বা আমার সেই আশাটা পূর্ণ করেছেন। পাশাপাশি শাশুড়ি মাও আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন।

বিয়ে হওয়ার পর আমার মনে হতো একটা বাপের বাড়ী ছেড়ে আমি আরেকটা বাপের বাড়ীতে আসলাম। সব ভালবাসা আমি আব্বা-আম্মা (শশুর-শাশুড়ীর) কাছে থেকে পেয়ে আসছি। বিশেষ করে আব্বা সবসময় আমাকে নিজের মেয়ের মতো আগলে রেখেছেন তাই আমি আজ এতদূর আসতে পেরেছি।

সবশেষে বলতে চাই, আব্বা আমাদের বটবৃক্ষ। উনার ছায়ায় আমরা সবাই একে অপরের সাথে মিলেমিশে আছি। উনি ছাড়া আমাদের ডেপুটি বাড়ী অস্তিত্বহীন। আল্লাহ আব্বাকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আমীন।

আমির মোহাম্মদ খান

[২য় পুত্র ও ৬ষ্টষ সন্তান]

সহকারী অধ্যাপক ইংরেজী, বাংলাদেশ আর্মি ইউনির্ভাসিটি সৈয়দপুর

সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট চিত্র হচ্ছে অন্যায় মেনে নেয়া, অন্যায়ের পক্ষে রায় দেয়া, নির্যাতিতের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে তাকে ভিটেছাড়া করা, মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করা। সারাজীবন অত্যন্ত অনাড়ম্বর অথচ রুচিশীল জীবনযাপন করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে, উপরোল্লিখিত সমাজের নিকৃষ্ট চিত্র থেকে সমাজকে রক্ষা করে আমার আব্বা সকলের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন। আমরা দেখেছি, সমাজের নিপীড়িত যে মানুষটির পক্ষে কোন সমর্থক কর্তাব্যক্তি বা কেউ নেই আব্বা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিচার পাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন বারবার। নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন, পড়াশুনা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থেকে সবসময় আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন।

মেট্রিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পর্যন্ত সবখানে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে স্বাধীনতাপূর্ববর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ৬৮ ও ৬৯ এর আন্দোলন এবং ৭১ সালে গ্রামের পাশ্ববর্তী পুটিবিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রসদ সরবরাহ করে আব্বা যখন একটি স্বাধীন দেশ পেলেন তখন প্রথমবারের মত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিসিএস

পরীক্ষায় অংশ নিয়ে আব্বা ব্যাংক সার্ভিস পান, চাকরিতে যোগদান করেন নাই। চাকরিতে যোগ দান না করার মূল কারণ ছিল কাঙ্খিত প্রশাসন ক্যাডার না পাওয়া। যদিও এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, আব্বাদের সময়ে যারা প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পাননি ১৯৭২ সন এর পরে তাদেরকে সরকার ক্যাডার পরিবর্তনের সুযোগ দেয় এবং আব্বাদের সমসাময়িক এই সকল ক্যাডার পরিবর্তনকারী অফিসারগণ এর বেশিরভাগই পরবর্তিতে সচিব পর্যন্ত হতে সক্ষম হন।

উভয় বাংলা এবং ইংরেজি বলার এবং লেখার দক্ষতা আব্বার আছে। বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় কাজ করে এবং বিভিন্ন সময়ে লেখনীতে আব্বার ভাষাগত দক্ষতা তিনি প্রমান করেছেন প্রতিনিয়ত।

গ্রাম চুনতিকে ভালবেসে পরিবার নিয়ে সারাজীবন গ্রামে থেকে আব্বা প্রমাণ করেছেন কিভাবে আর চারটি সাধারণ কৃষকের মতো মাটির মানুষ হয়ে জীবনযাপন করা যায়। কৃষিকাজ, বেড়ীবাঁধা, গৃহস্থালির কাজ, জাল দিয়ে মাছধরাসহ এমন কোন কাজ নেই যা আব্বার অসাধ্য। একজন নিরলস, ব্যক্তিত্ববান, সৎসাহসী, নির্ভীক মানুষ হিসেবে আজও আমাদের সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন আব্বা। ন্যূনতম বিলাসিতা আব্বাকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। মাটিকাটা, বৃক্ষরোপন এইসব কাজ এমনভাবে করতেন যেন তিনি একজন পুরোদস্তর কৃষক, বেশিরভাগ সময় আব্বা নিজেকে কৃষক পরিচয় দিতেও আমি দেখেছি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাশ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়কে রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাত থেকে বাঁচাতে আব্বার সশস্ত্র অভিযান হিন্দু সম্প্রদায় আজীবন মনে রাখবে। ৮০ এর দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চুনতিতে ডাকাতি প্রতিরোধে আব্বার সশস্ত্র সজাগ থাকার কথা এবং সময়ে সময়ে সশস্ত্র অভিযানের কথা সমাজের কারোই অজানা নয়।

নিভৃতচারী, ধার্মিক অথচ অসাম্প্রদায়িক, নিরলস সমাজসেবক আমার বাবা কখনই উনার অবদানের মূল্য কারো কাছে চাননি বরং যখনই কোন সীকৃতি অর্জনের মুহুর্ত এসেছে তখনই অন্য মানুষকে তা পাইয়ে দিয়ে আব্বা প্রমান করেছেন সাধারণ হিসেবেই উনি থাকতে পরিতুষ্ট। যে সকল ইংরেজ কবি গ্রাম নিয়ে তথা গ্রামোন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন তাদের বেশিরভাগই আক্ষেপ করেছেন কারণ কোন সাহিত্য, কোন কবিতায় আব্বার মত মহৎ মনের গ্রামের মানুষের কথা ছাপা হয় না। কবি Thomas Grey বলেছেন,

"Let not ambition mock their useful toil,
Their homely joys, and destiny obscure.
Nor Grandeur hear with a disdainful smile,
The short and simple annals of the poor."

কোন অপ্রাপ্তির বেদনা, হতাশা এবং নিরাশা আব্বাকে কখনও গ্রাস করতে পারেনি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আব্বা যেন শতবর্শী হোন আর যে মাটির জন্য উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সে মাটিতে আরও অনেকদিন বিচরনের সুযোগ পান।

খাতুন নিশাত আফযা (নিশি)

[দ্বিতীয় পুত্রবধু]

হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪র্থ বর্ষ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ তা'আলাহ'র প্রতি যিনি আমাকে 'এই আত্মজীবনী'তে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

আমার শ্বশুর (সম্প্রতি আমার বাবা আমাদের ছেড়ে আল্লাহ'র ডাকে সাড়া দিয়েছেন) তাই এখন মনে করি উনিই আমার বাবা। তারপরেও পরিচয় সহজ করে দেওয়ার জন্য শ্বশুর লেখা কিন্ত আমার কাছে উনার স্থান আমার বাবার মতই। এই মহান ব্যক্তিকে নিয়ে লেখার সাহস আমার বেশি নেই। তথাপি আমার শ্বাশুড়ি মা'র সমর্থনে আমি কলম হাতে নিয়েছি। পাচ বছরে যতটুকু জেনেছি উনার মত ব্যক্তিত্ববান সরল মানুষ খুব কমই দেখা যায়। বাইরের মানুষ মনে করে থাকেন; কিন্তু যারা উনাকে কাছ থেকে জানেন একমাত্র তারাই বুঝবেন এই গম্ভীরতার পেছনে একটি সুন্দর মন আর ছোট বাচ্চার মত কোমল হৃদয় তিনি লুকিয়ে রেখেছেন।

যখন পরিবারের সবাই মিলে আড্ডা দিতে বসা হয়, তখন তিনি এমন অনেক কিছু বলেন, যেমন অতীতের অনেক ঘটনা অথবা অনেক শিক্ষনীয় বিষয়, যা আমাকে মুগ্ধ করে। তখন মনে হয় উনাকে আরো আগে পাওয়া দরকার ছিল, তাহলে আরো অনেক কিছু শিখতে পারতাম, জানতে পারতাম। তবে এখনো শেখার চেষ্টা করছিলাম না- তা-না।

উনার সাথে যখন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়,তখন ভ্রমণ'টা পরিপূর্ণতা পায়। তিনি পরিবারের লোকদের সাথে ঘুরতে এতটা উপভোগ করে তা দেখলে মনটা ভরে ওঠে।

ইচ্ছে করে উনাকে নিয়ে যেন পুরো বাংলাদেশটা ঘুরে দেখি। সুযোগ থাকলে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো।

উনার মনোবল আমাদেরকে সামনে আগানোর প্রেরণা জোগায়। এমন মানুষ পরিবারে একজন থাকলেই যথেষ্ট; পুরো পরিবার যেন আলোয় আলোয় ভরে যায়। এই মহৎ মানুষের পরিবারের একজন হতে পেরে আমি এতোটাই

গর্ববোধ করি অনেক সময় মনে হয় যেন এটা আমাকে মানায়না। কারণ উনার মর্যাদা, জ্ঞান ও সম্মানের কাছে আমি তুলনাহীন। উনার পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাকে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে। এমন মহৎ মানুষের সংস্পর্শ পাওয়া অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। উনার আত্মজীবনী প্রকাশ হতে যাচ্ছে শুনে ভেবেছিলাম বিস্তারিত অনেক কিছু লিখব। কিন্ত কলম ধরলে বুঝতে পারি লেখকের গুণাবলী আমার মাঝে নেই। তাই পরিশেষে বলতে চাই মহান আল্লাহ তা'আলা যেন এই মহৎ মানুষটিকে আমাদের মাঝে আলো ছড়ানের জন্যে আরো অনেক অনেক নেক হায়াত দান করেন। (আমীন)

শুনেছি নামের প্রভাব নাকি সবার উপরে প্রভাব ফেলে। তাই আমি অনেক আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলাম আল্লাহ যদি আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন দাদার নামের সাথে মিলিয়ে ওর নাম রাখবো যেন দাদার গুণাবলীর কিছুটা হলেও সে পায়। আলহামদুলিল্লাহ নামটা আমি রাখতে পেরেছি। ভবিষ্যতটা আল্লাহ'র হাতে।

কনিষ্ঠাকন্যা

মেহের নিগার (তাজিন)

(চ.বি) বিএ (অনার্স) এমএ (পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন)

- "জ্ঞানী বাবা সেইজন যিনি তাঁর সন্তানকে জানেন"।

শেক্সপিয়রের এই উক্তি আমার বাবার ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। আমাদের সবাইকে নজর এ রাখতেন বাবা আর বাবার চোখ। কলেজে ক্লাস, ব্যবসায়ীক কর্মব্যস্ততা, সামাজিক দায়িত্ব শেষে বাড়ি ফিরে এসে আবার আমাদের পড়ালেখার খোজখবর রাখা খুবই পরিশ্রম এর কাজ। বাবা এই কাজটি খুবই ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। আমরা ৮ ভাইবোন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে আমার বাবার অবদান সবচেয়ে বেশি।

সন্দেহাতীত ভাবে আমাদের কাছে আমাদের বাবা সেরা, আমাদের পৃথিবী, আমাদের আদর্শ, আমাদের অনুপ্রেরণার আশ্রয়স্থল। ভয়কে জয় করার সাহস আমাদের বাবা। নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে আমাদের সব আবদারের অফুরন্ত ভান্ডার আমাদের বাবা। শত শাসনের পরও নিবিড় এক ভালবাসা।

বাবা আপনার আত্মজীবনী প্রকাশের অপেক্ষায় রইলাম। আপনার জন্য রইল শুভেচ্ছা ও অকৃত্রিম ভালবাসা।

মাহতাব উদ্দীন আহমদ রাফি

(নির্বাহী অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ)

জীবনে চলার পথে সফল মানুষ পাওয়া দুষ্কর। তার মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মজীবন এবং ধর্মীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব আরো অপ্রতুল। এমনি একজন ব্যক্তিত্ব, নিজের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা এই বইয়ের রচয়িতা, সম্পর্কে আমার শ্বশুর আমিন আহমদ খান।

ঢাকা বিশবিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পর নিজের উজ্জল ভবিষ্যত জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যাংকিং সার্ভিসে সরকারি চাকরি হওয়ার পরও নিজ গ্রামে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

এর পরবর্তীতে চুনতি মহিলা কলেজের প্রতিষ্টা লগ্ন থেকে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং এই কলেজ থেকেই প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

পথিকৃৎ নামক এনজিও প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির দায়িত্ব থাকাকালীন সামাজিক বনায়ন এর মাধ্যমে চুনতি অভয়ারণ্য এর হারিয়ে যাওয়া জৌলুশ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। চুনতি অভয়ারন্য এর সহব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি থাকাকালীন এই অভয়ারণ্য জাতিসংঘ ইকুয়েটর প্রাইজ পায়।

সততা ও যোগ্যতার কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন লোহাগাড়া থানার এলাকা ভিত্তিক কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। এখনও তিনি এ দায়িত্বে বহাল আছেন।

ধর্মীয় ভাবে তিনি একজন সফল ব্যক্তি। ১৯দিন ব্যাপী সীরত মাহফিল এর অর্থ কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পারিবারিক জীবনে আট সন্তান এর জনক এই ব্যক্তির প্রত্যেকটি সন্তান-ই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী; যাদের মধ্যে বিসিএস ক্যাডার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, উকিল, ব্যাংকার রয়েছেন।

সততা, সাহসিকতা, কর্মঠ, সংগ্রামী, সামাজিকতা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে এলাকার হিন্দু, মুসলমান, বড়ুয়া, খ্রিষ্টান, সকলের কাছে তিনি একজন জনপ্রিয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

এমন একজন ব্যক্তির পরিবারের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আল্লাহর কাছে ওনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আব্বার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র

ইমতিয়াজ আহমদ খান আসিফ

টিম মেম্বার (বিএসআরএম)

আমার আব্বা আমিন আহমদ খান, বর্তমান বয়স ৭২ চলমান। সারাজীবন কাজ করেছেন, কোনো সময় নষ্ট করেননি, প্রতিটা মূহুর্ত কাজে লাগিয়েছেন। প্রত্যেকদিন সকালে বাড়ি থেকে মোটর সাইকেল এ বের হন, কোনো না কোনো কাজ থাকে, মিটিং ইত্যাদি থাকলে তিনি সবার আগে ঠিক সময়ে উপস্থিত হন। অন্যথায়, নিজের খামার বাড়িতে গিয়ে হালচাষ, বাগান, গরুছাগল, মাছ প্রকল্প দেখাশোনা করেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বিকালে বের হন না; লোকজন আসে,সামাজিক আলাপ। আলোচনা হয়। আমাদের বন্ধুরাও একই বৈঠকে আব্বার সাথে গল্পগুজব করে। আব্বার মোটরসাইকেল অনেক পুরানো,তবে খাটি জাপানি হোন্ডা,চলে ভালো, অল্প দূরত্বে একবেলা যাতায়াত করেন, দশবছর কর পরিশোধিত।

আম্মা প্রায়ই অনুযোগ করেন- "তুমি রিটায়ার্ড মানুষ, তোমার কি অফিস আছে? প্রত্যেকদিন কাপড়-চোপড় পড়ে অফিসে যাওয়ার মত যাও কোথায়?" আব্বা মৃদু হেসে চুপ থাকেন, আম্মাকে অতকিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সরল সোজা মহিলা, দিনরাত "হুজুরায়" বসে "তপ" করেন। দুনিয়াদারীর খবর রাখেন না।

লোকজন আব্বাকে অনেক পয়সাওয়ালা মনে করে, তাই গরীব লোকজন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়। আমার জানা মতে আব্বার তেমন কোনো নগদ মূলধন নাই, বরং অনেক টাকা ব্যক্তিগত কর্য আছে। তারপর ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বান্দার কাছে আব্বা কোনো রকম সহায়তা চাননি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অভাবেও রাখেননি, ইজ্জত সম্মান সহ চালিয়ে নিয়েছেন-এটাই শুকরিয়া।

আমরা আব্বার ৮ সন্তান প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হইনি, তবে জীবন গড়ার প্রেরণায় মিনিমামের উপর সন্তুষ্ট থেকে চালিয়ে নিয়েছি। আব্বার আব্বা ব্রিটিশ সরকারের বড় কর্তা থাকা স্বত্ত্বেও সততার কারণে কোনো আলিশান ঘরবাড়ি ধনসম্পদ কিছুই করেননি। আব্বারা ৭ ভাই অতি দারিদ্রের মধ্যে নিজ প্রচেষ্টায় লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই উদাহরণ আমাদের সামনে আব্বা তুলে ধরতেন; বলতেন জীবন সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম ও আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস সাফল্যের গ্যারান্টি। শ্রমকে যেন অসম্মান এর চোখে দেখা না হয়। আব্বারা ৭ ভাই, আমরা ৮ ভাইবোন। আব্বার উপদেশ মাথায় রেখে কঠোর পরিশ্রম করে গেছি, লোকে মনে করে আমরা সবাই সফলতার দ্বারপ্রান্তে, কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ নেই।

আব্বা-আম্মাসহ আমরা ৮ ভাইবোন সবাই গ্রামীন চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পাশ। পরবর্তীতে শুধু নিজের প্রচেষ্টায় সবার দোয়ায় ও আল্লাহ'র রহমতে আমরা পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি। প্রাইভেট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে খরচ যোগান আব্বার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আব্বার মত আমরাও অর্থাভাবে কোনো হলে থাকতে পারিনি, এদিক-সেদিক থেকে অল্প খরচে চালিয়ে নিয়েছি। আমার বড় বোন ক্লাস ৯ এ গণিতে অল্প নম্বর এ ফেল করেছিল, হেডমাস্টার তাকে সতর্ক করে প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন। আব্বা বলেছিলেন তাকে এক বছরের জরিমানা করে আবার পরীক্ষা দিতে হবে, যাতে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়। পরবর্তীতে সে এসএসসি তে ফার্স্ট ডিভিশন; বি.কম-এ চার নম্বর মেধাতালিকা সহ এম.কম পাশ করে বিসিএস পুলিশ সার্ভিস-এ কর্মরত।

ভাইদের মধ্যে আমার মনে হয় আমি সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছি, কারণ আব্বার উপদেশ সবসময় আমার মনে পড়ত। আমাদের খামারবাড়ি করার সময় আমি শ্রমিকদের সাথে মাটি কাটতাম, হালচাষ করতাম।

মুরগির খামার বানিয়ে সেখানে মুরগি লালন পালন, ডিম সংগ্রহ-বিক্রি করা, নিয়মিত পরিষ্কার করা, ধোয়মোছা করা- সব কাজ আমি নিজে করতাম। এখনও আমাদের গরুর খামারের গরু পরিচর্যা আমি নিজে যতদূর সম্ভব করি। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ফেরার পথে নিজস্ব রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে বাড়ির জন্য লাকড়ি নিয়ে আসতাম।

একদিন এক বন কর্মকর্তা আমাকে এই অবস্থায় দেখে আব্বাকে অভিযোগ দিয়েছিলেন এই বলে যে, আপনার সব ছেলে মেয়ে তো প্রতিষ্ঠিত, একটা ছেলে এভাবে লেখাপড়া না করে কাঠ কাটে কেন? আমার অনেক গরীব বন্ধুবান্ধব কেও আমি নানান কাজে সহায়তা করতাম। চাষের ধান খামার থেকে তৈরী করে পৌঁছানো, শুকিয়ে কাঁধে করে গোলাজাত করার সময় আম্মা বাধা দিতেন, বলতেন লোকজন তো আছে, তুই কেন এত শারীরিক পরিশ্রম করিস। আমি বলতাম আল্লাহ'র দেওয়া শরীর একটু বেশি মুটিয়ে গেছি, কমানো দরকার। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার এখনও কোনো আগ্রহ নেই।

চাকরি একটা করি, যা পাই সবাইকে নিয়ে খাই-দাই-উড়াই। জমা-টমা নাই।

এখনকার চাকরিটা ও বেশ পরিশ্রমের, সেলস্ এর কাজ, সবসময় দৌড় এর উপর থাকি। আমার ভালই লাগে, মনে পড়ে আব্বার উপদেশ। তাই কাজকেই প্রাধান্য দেই। আব্বার উপদেশ তো বৃথা যায় নি, কাজও করেছি-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিও নিয়েছি। সবই আল্লাহ'র মেহেরবানী। আব্বাকে আমাদের ছায়াদানকারী হিসেবে রাব্বুল আলামীন হায়াতে তৈয়বা এনায়েত করুন।

মুশফিকা রেজা সিদ্দিকা (তিথি)

বিবিএ (ফাইন্যান্স), চট্টগ্রাম বিশবিদ্যালয়

"নানাভাই" শব্দটা শুনলেই আমাদের মনের মাঝে একজন গম্ভীর, বয়স্ক এবং মোটা চশমা পরিহিত ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে, যার জীবন অস্তমিত সূর্যের ন্যায় নুয়ে পড়ছে!!

তবে ছোটবেলা থেকেই একটা প্রবাদ শুনে এসেছি "ইংরেজী গ্রামারেরও নাকি ব্যতিক্রম আছে"। ঠিক তেমনই ব্যতিক্রম ধর্মী একজন ব্যক্তি; যার কাছে উপরের প্রদত্ত সকল উপমা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য। সত্তর বছরের কোঠায় পা দিয়েও যিনি ঠিক একুশ বছরের যুবকের ন্যায় হাসি-খুশি, প্রাণোজ্জ্বল, চিরসবুজ এবং আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণার ভান্ডার। তিনি আর কেউই নন; আমার পরম শ্রদ্ধেয় নানাভাই, জনাব আমিন আহমদ খান।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোনো প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করি, আমার বন্ধু-বান্ধব এবং কাছের সব ব্যক্তি আমায় জিজ্ঞেস করে "আমার সফলতার পেছনের অনুপ্রেরণা কি?"

আর আমি তখন মনে মনে বলে উঠি, যার নানাভাই জাতিসংঘ ইকুয়েটর পুরস্কার এর মত এত বড় অর্জন নিয়ে আসে সমগ্র দেশের জন্য, তাঁর নাতনি'কে তো সফলতা ছিনিয়ে আনতেই হবে।

পরিবারের বড় নাতনি হিসেবে সবসময় একচ্ছত্র আদর পেয়ে এসেছি আমার নানাভাই এর কাছ থেকে। ঠিক তেমনি একচ্ছত্র ভাবেই ভালবাসি তাঁকে। আজ আমার নানাভাইয়ের জীবনী গ্রন্থ "আত্মকথন" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে; এটা সত্যিই আমাদের সবার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই এই প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

নানাভাই আমাদের সবার গর্ব, আমাদের অহংকার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নানাভাই'কে আরও অনেক বৎসর আমাদের মাঝে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক।

হারুন রেজা সিদ্দিকী (রাহিক)

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল (এমবিবিএস শেষবর্ষ)

আমি হারুন রেজা সিদ্দিকী, আমার শ্রদ্ধেয় নানা জনাব আমিন আহমদ খান এর বড় নাতি।

আমার নানার সম্পর্কে বলার জন্য এই কয়েকটা লাইন নিতান্তই ক্ষুদ্র কারণ তিনি নিজেই একজন বড় 'উপন্যাস', তথাপি, তার জীবনীতে অংশগ্রহণ এর জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

নানার সম্পর্কে বলতে হলে সবার আগে ওনার বড় পরিচয় তিনি একজন সফল সমাজ সংগঠক। আমাদের চুনতি গ্রামের ডেপুটি পাড়া সমাজের একজন অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তিনি। যার কাছে সকলেই যেকোন সময়ে সব রকমের সমস্যার সমাধান পেয়েছেন। তিনিও সারাজীবন মানুষের সেবা করে যাওয়াকে জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। তিনি যথাক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। চাকরি জীবনে তিনি একজন সফল এনজিও কর্মকর্তা ও একজন সফল শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

তারপর যদি বলতে হয়। তিনি একজন সফল বাবা, যিনি আট সন্তানের জনক। সন্তানদেরকে যার যার সফলতার স্থানে পৌঁছাতে তিনি সর্বদা সকল সহযোগিতা করে গেছেন। এই মহান ব্যক্তির নাতি হিসেবে আমি গর্বিত।

নানাকে আমি আমার জীবনের রোল মডেল হিসেবে মনে করি। আরও অনেক বছর আমাদের সকলকে ছায়া দিয়ে যাক এই মহান "বটবৃক্ষ"। মহান আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি।

চৌধুরী নাফিস ফুয়াদ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস [২য় বর্ষ] (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

নানুভাইয়াকে নিয়ে লেখা শুরু করলে শেষ হবেনা জানি।

আমি নাফিস, নানার নাতি-নাতনিদের মধ্যে ৩য়। নানার জীবনী লেখার সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নানুভাইয়া হচ্ছে একটা বটবৃক্ষের মত, আর আমরা সবাই হলাম তার ডাল-পালা। নানার ছায়ায় যেন পরম আদরে থাকি।

আমাদের গ্রাম চুনতিতে নানার অবস্থান খুব উচ্চ পর্যায়ে। গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে 'জুনু মিঞা' নামটা যেন সকল সমস্যার সমাধান।

নানাভাই অত্যন্ত কঠোর দেখতে,আসলে তিনি ভিতর থেকে অনেক সরল ও কোমল মনের একজন মানুষ। নানার জীবনের প্রাপ্তি অনেক বেশি, বিভিন্ন সংস্থার সাথেও নানা নিজেকে জড়িত রেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

আম্মুদের ভাই-বোনদের সবার মধ্যে সম্পর্ক ভাল। এইটার ক্রেডিট অবশ্য আমি নানুভাই কে'ই দিব। কেননা উনিই শিখিয়েছেন কিভাবে সকলে মিলে এক হয়ে থাকা যায়।

আল্লাহ'র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন নানাকে আরো অনেক বছর আমাদের মাঝে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন।

শফিকা রেজা সিদ্দিকী (বুশরা)

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি (আইন অনুষদ) [১ম বর্ষ]

মানুষ চাইলে খুব সাধারণভাবে নিজের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে। আমাকে যদি কখনো বলা হয়, এমন একজন মানুষের নাম বলো, যে খুব অসাধারণ হয়েও অতি সাধারণ জীবনযাপন করছে।

তাহলে অবশ্যই আমি বলব তিনি আর কেও নন আমার নানাভাই শ্রদ্ধেয় আমিন আহমদ খান। যার প্রতিভার কোনো অন্ত নেই। তিনি যেমন বন্দুক হাতে ধরে শিকার করতে পারেন, আবার তিনিই পারেন অনেক বড় বড় উপদেশ দিতে যা হয়ত অনেক কবি সাহিত্যিক ও পারবে না।

"রবীঠাকুর" তার এক কবিতায় বলেছেন,"মানুষের কত কীর্তি, কত

অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে"।

অর্থাৎ একজন মানুষ জীবনের বৃদ্ধ বয়সে এসে হিসাব করে দেখলে হয়ত দেখবেন তার প্রাপ্তির খাতায় অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু আমার নানা আমিন আহমদ খান এমন একজন মানুষ, আমি দেখি এবং বিশ্বাসও করি যে নানার প্রাপ্তির খাতায় কোনো অপূর্ণতা নেই। নানা নিজের জীবনটা কে নিজের মত করেই গুছিয়ে চলেছেন আজীবন। খুব সুন্দর ভাবেই সাদামাটা একটা জীবন নিয়ে হাসিখুশি ভাবে থাকতে দেখেছি সবসময় নানাভাইয়াকে। নানা সবসময় বিভিন্ন সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার কে সমৃদ্ধ করেছেন। অহংকার বলতে কোনো কিছু আমি নানার মধ্যে দেখিনি কখনোই।

আমি বুশরা' নানুভাইয়ার নাতি-নাতনিদের মধ্যে চতুর্থ। সব সময় দেখেছি নানাভাই অন্যরকম একটা মানুষ। ঠিক এমন যার সাথে অন্য কারো তুলনা করা যায় না। নানার তুলনা শুধু তিনি নিজেই।

এইতো ২০১৪ সালের কথা নানা-নানুসহ আমরা ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম বেড়াতে। কলকাতা হতে আগ্রা যেতে ট্রেনে প্রায় ৪২ ঘন্টা লেগে যায়। তখন খুব বিরক্তিবোধ করছিলাম কিছুক্ষণ পরে নানুভাইয়া তা বুঝতে পেরে আমাদেরকে নানারকম মজার মজার প্রশ্ন করা শুরু করলেন, তা ছাড়া আরো কত কথা বলেছিলেন। তখন মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো সব বিরক্তি কোথায় হারিয়ে গেছে। এইভাবে ক্ষণেই বিরক্তিকর মুহূর্তকে আনন্দময় করে তোলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে নানুভাইয়ার।

যেকোন মানুষ প্রথম বার নানার সাথে কথা বলে, নানার ভক্ত হয়ে যাবে। আসলে নানার ভক্ত হতে বাধ্য হবে, এইরকমই অন্যরকম একজন মানুষ তিনি। যাকে দেখলে মনে হবে খুবই গম্ভীর প্রকৃতির, আসলে নানা খুবই গল্পপ্রিয় একজন মানুষ।

আমি ছোটবেলা থেকেই খুব চঞ্চল স্বভাবের ছিলাম। তাই নানুভাইয়া আদর করে আমায় ডাকেন 'টনটন' বলে। নানুভাইয়ার সাথে আমাদের সবারই খুব ভাল একটা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক।

আমাদের জীবনটাকে যদি কতগুলো বাদ্যযন্ত্রের সাথে তুলনা করি, তাহলে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের ভিত হচ্ছে ঐকতান। আর আমাদের জীবনের এই ঐকতান হচ্ছেন নানুভাইয়া। যার কাছে সবার সকল সমস্যার সমাধান থাকে। যেকোন সমস্যার সমাধান দিতে নানুভাইয়া তো পুরা এক্সপার্ট।

নানুভাইয়া দীর্ঘজীবি হোক। যেন আমরা নানার সাথে আরো অনেক সুন্দর সময় কাটাতে পারি।

নিশাত আনজুম চৌধুরী (নায়না)

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস্ পাবলিক কলেজ (দ্বাদশ শ্রেণি)

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "জীবনে কার মতো হতে চাও?" আমি নিঃসন্দেহে বলবো আমার নানাভাইয়ার মত, এই কথাটি বলার কারণ হলো তিনি আমার দেখা সবচেয়ে সফল একটি মানুষ!

আমার নানাভাইয়ের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমাকে সবসময়ই মুগ্ধ করেছে। তিনি সারাটি জীবন অন্যের স্বার্থে কাজ করেছেন। আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে খুব সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেও সুখী থাকা যায়। তিনি আমাদের সবসময় শিখিয়েছেন ভালো পথে চলতে অন্যদের সাহায্য করতে এবং নিজেকে একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে।

আমি সবসময় দেখেছি নানাভাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, তিনি তার সন্তানদের কেও তাই শিখিয়েছেন।

নানাভাইয়ের চরিত্রের আরেকটি বিশেষ গুণ তিনি মানুষকে অনেক হাসাতে পারেন। তার কৌতুকবোধের জন্য ও আমাদের সকলের প্রিয় তিনি।

আসলে কিছু শব্দ কখনোই নানাভাইয়ের ব্যাপারে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। নানা আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ মহান আল্লাহ'র কাছে সবসময় দোয়া করি যেন তিনি নানাভাইকে সবসময় ভালো রাখেন ও আরো অনেক বছর বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আমার আল্লাহ'র কাছে আরো দোয়া যেন আমি জীবনে ভালো কিছু করে নানাভাইকে গর্বিত করতে পারি।

খাদিজা সিদ্দিকা

ঢাকা সিটি কলেজ (দ্বাদশ শ্রেনী)

শ্রদ্ধেয় নানাভাই সম্বন্ধে কিছু লেখার আগে মনে পড়ে গেল আমার শৈশবের মজার এক স্মৃতি। দিনলিপি লেখা ছিল আমার নিয়মিত অভ্যাস। সেই অভ্যাস এর সূত্র ধরে একবার আমার এক দিনলিপিতে লিখেছিলাম "আমার নানা একজন প্রাচীন মানুষ" সেই সময়ে কি বুঝে তা লিখেছিলাম জানি না। কিন্ত এতবছর পর বুঝতে পারছি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সর্ব বিষয়ে নানাভাই এর গভীর জ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছিল। চুনতির একজন প্রবীণ ব্যক্তি হিসেবে চুনতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে তিনি রেখেছেন একচ্ছত্র আধিপত্য। যে সুগভীর জ্ঞান ও দীর্ঘলব্ধ অভিজ্ঞতার ছায়াতলে আমরা আছি সে জ্ঞানের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে। শুভকামনায় আমি নানার নাতনি।

সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

গণভবন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
[নবম শ্রেণী]

জুনু মিঞা চুনতি গ্রামের এক বিখ্যাত নাম। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি সম্মানিত, অনন্য মর্যাদাবান। আমি আমার এই ছোট্ট জীবনে যতদূর দেখতে পেয়েছি তিনি একাধারে জ্ঞানী ও অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী। ছোটবেলার সেই স্মৃতি এখনো মনে পড়ে যখন তিনি ঘরের উঠোনে চকলেট ছুড়ে আমাদের দুভাইকে বলতেন ইঁদুরে চকলেট ফালাইয়ে! আমরা জিজ্ঞেস করতাম 'হত্তু ফালাইয়ে?" তিনি বললেতন, 'ছাদরতুন।" কি আর করার আমরা সেটা মেনে নিয়েই খেতাম। তিনি কথায় কথায় ছড়া কাটতেও পছন্দ করেন। বেশ মজার মজার ছড়া আবার শিক্ষণীয় ও বটে, শুনে না হেসে উপায় নেই! টেবিলে খাবার দিলে "ভাত খাবা"? এর বদলে তিনি বলতেন "ভাত ব্যাবহার গরিবানে?!" ওনার সাথে খামারে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি গুলোও মনে পড়ে। বাগান দেখা, ধানক্ষেত দেখা, একটার পর একটা তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, রুই মাছ ধরা ও সেগুলো বাসায় এনে খাওয়া, অনেক সময় পিকনিক করে ওখানেই রান্না করে খাওয়া কি যে মজা! তাই প্রতিবার গ্রামে গেলেই ওনার সাথে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ মিস করি না! আমি গর্বিত ওনার মতো একজন নীতিবান ও আদর্শ মানুষকে নানাভাই হিসেবে পেয়ে। নানাভাই বই লিখছেন শুনে খুব খুশি হয়েছি। আপনার জীবনীগ্রন্থ আমাদেরকে সাহায্য করবে জীবন চলার পথে। এই বই আমাদের জন্য জীবন পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। অনেক অনেক শুভকামনা রইলো নানাভাই!

মোঃ নূরুল্লাহ সিদ্দিকী

গণভবন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (দশম শ্রেণী)

জুনু মিয়া আমার নানাভাই। যার কথা না বললেই নয়। গরীব দুঃখী থেকে শুরু করে ধনী পর্যন্ত সবার কাছেই নানাভাই বন্ধুর মত। নানার মত একজন ব্যক্তির নাতি হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি এমন একজন মানুষ যাকে পুরো চুনতিবাসী একনামে চেনেন। ছোটকাল থেকেই দেখে আসছি তিনি খুবই মজার একজন মানুষ। আমাদের মন খারাপ হলেই তিনি নানাভাবে মন ভালো করার চেষ্টা করতেন। এখনও মনে পড়ে আমার মন খারাপ হলেই তিনি আমাকে "সাদি আলমের" দোকানে নিয়ে গিয়ে চকলেট কিনে দিতেন। তিনি সকলকে তাদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী নিজের পছন্দমত নামে ডাকেন। যেমনঃ আমাকে ডাকতেন "সিদ্দিকে নুরু" আবার আমার ভাইকে ডাকত টেকুল। আবার এর সাথে ফর্দ জুড়ে দিয়েও তিনি বেশ মজা পেতেন। আমাকে বলতেন, "সিদ্দিকের চামড়া,তুলে নেবো আমরা"। এরকম কথাগুলো শুনে আমাদের হাসির বাধ ভেঙে যেত। পুরনো বাংলা গান শুনতেও পছন্দ করেন খুব নানাভাই। ক'দিন আগেই তিনি আমার থেকে অনেক পুরনো গানে ভর্তি পেনড্রাইভ নিয়ে যান। এসময় নানা আমাকে বলেছিলেন, "আমার স্বাদ না মিটিল, আশা না ফুরাইল" কিন্তু বেয়াজ্জুনোর আগে দেয়া ফরিব।

নানা তার মধ্যে পুরনো দিনের ও নতুন দিনের সাহিত্য লালন করেন। যে সাহিত্যে স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে থাকলে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদের জীবন আরও ভালভাবে উপভোগ করতে পারবে।

লেখক পরিচিতি

আমিন আহমদ খান, জন্ম-১৯৪৬ সালের ২ আগস্ট বাবা কবির উদ্দিন আহমদ খান এর ১৪ জন সন্তানের মধ্যে তিনি ১৩ তম। বাবা ছিলেন চুনতির বিখ্যাত ডেপুটি বংশের নাছির উদ্দিন ডেপুটির নাতি, অবিভক্ত বাংলার সিভিল সার্ভিস এর সদস্য। লেখক চুনতি হাইস্কুল থেকে এসএসসি, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় থেকে বিএ (অনার্স) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয় থেকে এম.এ পাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি চুনতিতে একটি মুক্তিযুদ্ধা সহায়ক দল গঠন করেন। এই দলের কাজ ছিল স্থানীয় হিন্দু পাড়া সমূহ পাহারা দেওয়া যাতে রাজাকাররা হিন্দুদের উপর নির্যাতন লুঠপাঠ চালাতে না পারে।

এছাড়া পুটিবিলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এই দলের মাধ্যমে চাল, ডাল, তরকারী, মাছ-মাংস সরবরাহ করা হয়। স্বাধীনতার পর তিনি বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু প্রশাসন ক্যাডার চাকুরী না হওয়ায় তিনি সার্ভিসে যোগ দেননি। এম.এ পাশ করে প্রথমে একটি ফিশিং কোম্পানিতে কিছুদিন চাকরি করেন; তিন বছর পরে চাকরি ছেড়ে চুনতি চলে আসেন ও বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। চুনতি মহিলা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রভাষক হিসাবে শুরু করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে অবসরে যান। পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ (পাঁচ) মেয়ে ও ৩ (তিন) সন্তানের জনক।

ভূমিকা

আমার বাপ দাদারা সবাই মূল্যবান লোক ছিলেন। লোক মুখে তাঁদের অনেক গৌরবগাঁথা শুনা যায়। দুঃখের বিষয় তাঁরা কেউই আমাদের জ্ঞাতার্থে-কোন কিছু লিখে যান নি যা হয়তো আমাদের চলার পথের পাথেয় হতে পারতো। এসব ব্যাপারে চিন্তা করে আমি দুঃখ পেতাম, মনে হতো আমার অবশ্যই কিছু করা উচিৎ। এ চিন্তা থেকেই এ বই লেখা শুরু করি। মুখে মুখে যা শুনেছি তা থেকেই বাপ দাদা ও বড়দাদা সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করেছি এর বেশি কিছু আমার জানা নাই বাকি অংশ আমার জীবনীভিত্তিক। আমার ছেলেমেয়ে-নাতি নাতনীরা আমার জীবন সম্বন্ধে জানতে চায় ও আমাকে তাগাদা দেয়; হয়তো তাদের জন্য ভবিষ্যতে আমার উদাহরণগুলো কাজে আসতেও পারে। আমি মনে করি বংশ পরম্পরায় জীবন ইতিহাসগুলো উদ্দ্যোগ নিয়ে সংগ্রহ করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজনও স্নেহভাজনরা বাণী পাঠিয়ে আমাকে উৎসাহিত করায় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ভুলত্রুটি সব আমার, পাঠকের মতামত ও পরামর্শ স্বাদের গ্রহণযোগ্য।

বংশ পরিচয়

আব্বা একদিন একটি কংক্রিটের জমানো পিলার নিয়ে চুনতির ঈদগাহ পাহাড়ে (বর্তমানে যেখানে ফাতেমা বতুল মহিলা মাদ্রাসা অবস্থিত এর কিছুদূর উত্তরে) যান। পায়ে চলার পথের পূর্বে প্রায় নিশ্চিহ্ন একটি কবরের উপর পিলারটি স্থাপন করেন। আমরা কয়েকজন আব্বার পাশেই ছিলাম; কবরটি আমাদের বংশের পূর্বপুরুষ ক্বারী আবদুর রহমান এর বলে নিশ্চিত করেন ও আমাদেরকে কবরটি সংরক্ষণ করতে বলেন। পরবর্তীতে পিলারটি চুরি হয়ে যাওয়ায় আমরা কবরের চারপাশের দেয়াল ঘেরা দিয়ে দেই।

ক্বারী আবদুর রহমান এর দুই ছেলের পরিচয় জানা যায়- মৌলানা আবদুল হাকিম (রহ) ও নাছিরুদ্দিন খান ডেপুটি (রহ)। কথিত আছে মৌলানা আবদুল হাকিম (রহ) সৈয়দ আহমদ বেলভীর সহচর হিসেবে বালাকোট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ কারনে তাঁকে গাজীয়ে বালাকোট বলা হয়। পরবর্তীতে তিনি চুনতিতে স্থায়ী নিবাস করেন। ছোট ভাই নাছিরুদ্দিন খান ডেপুটি পাশাপাশি পাড়ায় চলে আসেন। তাঁর নামানুসারে বর্তমান এই পাড়া ডেপুটি পাড়া নামে পরিচিত। পাড়ার মাঝে একটি মনোরম টিলার ওপরে তাঁর বাড়ি করার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু কম বয়সে বড় ভাইয়ের আগে ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় বড় ভাইয়ের নির্দেশে এই টিলার ওপর তাঁকে কবর দেওয়া হয়ও পাশাপাশি একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। বড় ভাই মৌলানা আবদুল হাকিম (রহ) এর মৃত্যু হলে তাঁকেও ছোট ভাইয়ের পাশে কবর দেওয়া হয়। বর্তমানে জায়গাটি ডেপুটি পাড়া মসজিদ ও ঐ দুই ভাইয়ের দরগাহ নামে পরিচিত।

আমার দাদা মুহম্মদ তৈয়ব উল্লাহ খান বৃটিশ সরকারের অধীনে পুলিশের ইনসপেক্টর ছিলেন। দাদার ৬ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে আব্বা কবির উদ্দিন আহমদ খান সবার বড়। ইংরেজি বিষয়ে বি.এ অনার্স পাশ করে তিনি অবিভক্ত বাংলার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তখনকার দিনে বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দেরকে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দিত না। তাই আব্বাকে ও প্রথমে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি অভিমান করে অনেকদিন চাকরিতে যোগ দেন নাই কারণ তিনি সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রত্যাশি ও যোগ্য ছিলেন। পরে সংসারিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন ঐ পদ থেকেই। কৃতিত্বের সঙ্গে চাকরিজীবন শেষ করে ১৯৫২ সালে সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে অবসর প্রাপ্ত হন ও চট্টগ্রামের

লোহাগাড়ার চুনতি গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি বাড়ি ঘর, জায়গা জমি কিছুই করেন নাই। পৈত্রিক একটি মাটির ঘরে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে ১৯৮৬ সালে মারা যান। মৃত্যুকালে তার কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স বা কোনো ধন সম্পদ ছিলো না। সামান্য পেনশনের টাকায় ও কিছু পৈত্রিক জমি বিক্রি করে দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যান।

আব্বা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ শতভাগ সৎ ও কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁর একমাত্র বিনোদন ছিল শিকার করে বেড়ানো। আম্মা সবসময় অনুযোগ করতেন- 'আপনি শুধু শিকার করে বেড়ান, বাড়ি-ঘরের দিকে খেয়ালই রাখেন না।' শোনা যায় শিকারে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক সময় ওনার চাকরিক্ষেত্রে অনেক সুযোগও নষ্ট হয়েছে। প্রমোশনের ব্যাপারে ওনাকে ডাকা হয়েছে। তিনি জবাব দিয়েছেন 'আমি একটু অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। একবার আগর তলায় তিনি একটি গয়াল শিকার করেছিলেন। মহারাজা তার বিরুদ্ধে গো-হত্যার অভিযোগ এনে কোর্টে মামলা করেন। গয়াল মহিষ জাতীয় প্রাণী হওয়ায় গো-হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবুও আব্বাকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হয়েছে। শিকার করা তখনকার সময়ে আভিজাত্য ছিল। রাজা বাদশাহরা 'মৃগয়া'য় যেতেন। আব্বা আভিজাত্যেরই প্রাধান্য দিতেন। আব্বার নিজস্ব ৩টি বৈধ বন্দুক ছিলো। পাখি শিকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের হরিণ বাঘ হাতি সবই তিনি শিকার করেছেন। তাঁর অনেক শিকারী বন্ধুও সাঙ্গ-পাঙ্গ ছিল। অবসর সময়ে সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজনে ২/৩ দিন বা এক সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড়ে থেকে যেতেন।

শিকারের মাংস ভাগাভাগির ব্যাপারে কতগুলো নিয়ম ছিল। এই নিয়মগুলোর প্রচলন কে করেছিলেন আমার জানা নেই। তবে এগুলি আব্বার সময় থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলা হয়েছে। উদাহারণস্বরূপ যারা শিকার পার্টির সদস্য হিসেবে গিয়েছে সে যেই কাজই করুক সবাই সমান একভাগ পাবে। এছাড়া প্রত্যেকটি বন্ধুকের জন্য এক ভাগ। যে বন্দুক দিয়ে মারা হবে তার মালিককে মাথা ও যে শিকার মারবে তাকে অতিরিক্ত এক ভাগ ও চামড়াটা দেয়া হবে। যাবতীয় খরচ আব্বার একার। অবশ্য কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি সংগে থাকলে অংশ গ্রহণ করতেন বা অনেক সময় একাই খরচ বহন করতেন। বাঘ এবং হাতি শিকারের বেলায় কোনো লাভ নাই, কোনো নিয়মও নাই। পাওয়া যায় শুধু বাহবা, সব খরচ আব্বার।

আব্বা মোটেও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাহলে প্রশ্ন আসে এত খরচ তিনি কিভাবে করতেন? জবাব হলো। ৫০/৬০ এর দশকে মুদ্রামান অনেক বেশি ছিল। আমরা ছোটকালে তিন দিনের জন্য কাচা বাজার করেছি মাত্র এক টাকায়। তিন

দিনে একবার হাঁট ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কোনো কাঁচা বাজার পাওয়া যেত না। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে বড় মাছ বা মুরগি কিনলে লাগতো প্রতিটির জন্য দুই তিন টাকা। পুকুর-ডোবা-খাল-বিল থেকে আমরা প্রচুর মাছ ধরতাম। শিকারের মাংস বাড়িতে জমা থাকতো। শিকারে গেলে ছোট হরিণ, বন মোরগ, মথুরা এসব মেরে খাওয়া হতো। ২/৩ মাইল থেকে ১৫/২০ মাইল পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া হতো। সুতরাং খরচের ব্যাপারটা তেমন বড় কিছু ছিল না। হরিণ শিকারে গেলে ১৫/২০ মাইল পাহাড়ি পথে হেঁটে ৩/৫/৭ দিন অবস্থান করে আমাদের বাড়িতে মাংস আসত ১ মন খানেক। ফ্রিজ ছিলো না তাই সব সেদ্ধ করে রাখতে হতো ও অনেকদিন ফ্রি খাওয়া মেহমানও জুটে যেত। বড় বড় বাঘ আমাদের বাড়ির আশেপাশেই থাকতো। চাষীদের বড় বড় গরু মারতো। বেচারা গরিব মানুষ আব্বাকে এসে অভিযোগ দিত। গাছের ওপর মাচা বেঁধে সারারাত পাহাড়া দিয়ে আব্বাই বাঘ নিধন করতেন। হাতি পাগল হয়ে গেলে সরকার কর্তৃক 'রোগ এলিফেন্ট' ঘোষণা করে মারতে বলা হতো। তখন আব্বা দলবল নিয়ে ঐ কাজে এগিয়ে যেতেন নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ।

আব্বার ১৪ সন্তানের মধ্যে আমি ১৩তম। মেয়ে-ছেলে অনুপাতে সমান সমান। আমি এবং দুইবোন ছাড়া বাকি সবাই আল্লাহর রাস্তায় প্রয়াত। ভাইয়েরা সবাই সুশিক্ষিত ও সম্মানজনক চাকরিতে সময় কাটিয়েছেন। বোনেরা কম শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত-সবাই সুগৃহিণী। মেয়েদেরকে তখনকার দিনে গৃহ শিক্ষক রেখে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপরেই সু-পাত্রে বিয়ে। বেশির ভাগ বিয়েই হতো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে।

চুনতির প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শুকুর আলী মুন্সেফ আমার আম্মার দাদা। তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন চট্টগ্রামের পটিয়ায়। প্রমাণ স্বরূপ পটিয়ায় মুন্সেফবাজার ও শুকুর আলী মুন্সেফ মসজিদ এখনও বর্তমান। কথিত আছে প্রতিটি মামলার রায় ঘোষণার আগে তিনি 'ইশতেহারা করে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। চুনতির বড় সমাজ মসজিদে ওনার মাজার এখনও ইঁদুরের উৎপাত ও অন্যান্য অসামাজিক অপরাধের জন্য লোকে অভিযোগ দেয়। তার ছেলেদের মধ্যে একজন কাজি সিদ্দিকুর রহমান আমার নানা। নানীর বাড়ি কক্সবাজারের ইদগাহ সম্ভ্রান্ত জমিদার পাড়ায়। আম্মার তিন ভাই মকছুদুর রহমান, মাহবুবুর রহমান ও মাখলুকুর রহমান। আম্মাই একমাত্র বোন-কোনরকম লেখাপড়া করেন নাই- শুধু ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নিজেই বলতেন ওনার বড়ভাই উকিল হয়ে আম্মাকে ৯ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছেন। মামাদের ছেলে-মেয়েরা সবাই উচ্চশিক্ষিত-সরকারি বেসরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা-শিক্ষাবিদ-ব্যবসায়ী।

ছেলেবেলা

মা বাবার কাছে শুনেছি আমার জন্ম দিনাজপুরে ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসে। সেই হিসাবে আমি সিংহ রাশি। আব্বা তখন সিভিল সার্ভিস থেকে ডেপুটেশনে সিভিল সাপ্লাইতে 'ডেপুটি এ্যাসিস্টান্ট রিজিওনাল কন্ট্রোলার অব ফুড' হিসেবে কর্মরত। তার সরাসরি বস ছিলেন মরহুম জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। আব্বার প্রমোশনের জন্য উচ্ছসিত সুপারিশ করে জনাব চৌধুরী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

ইংরেজিতে হাতের লেখা এই চিঠি আমি পড়েছিলাম। দুঃখের বিষয় চিঠিটা হারিয়ে যাওয়ায় আমি বিস্তারিত উল্লেখ করতে পারলাম না। জনাব গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী জনাম ইনাম আহমদ চৌধুরীর বাবা। যিনি চট্টগ্রামে এডিসি থাকাকালীন ওনার বন্ধু ও আমার ফুফাতো ভাই জনাব আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এর সঙ্গে চুনতি এসেছিলেন, আব্বার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য।

এরপর সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর হয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বদলি হয়ে আসেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে স্বপ্নের মত আমার একটু একটু মনে আছে। নুরুল আমিন এর রক্ত চাই' লেখা পোস্টার দেখেছি। আমিও আমার পিঠাপিঠি বড় ভাই বাসার কাছাকাছি মহাকালি পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। একদিন এক দিদি পিছন থেকে আমাকে মৃদু বেত মারেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে কে মারলো রে বলে চিৎকার দিয়েছিলাম। আব্বার সরকারি বাসা ছিল রাম গোপাল পুর জমিদার বাড়ি কোনো হিন্দু জমিদার এর পরিত্যক্ত ও সরকারের অধিগ্রহণকৃত একটি পুরানা একতলা দালান। দেয়াল ঘেরা সামনে পিছনে লোহার গেট। মনোরম ফুলের বাগানসহ সাজানো উঠান গেটের সামনের দিকে ছিল ঠাকুর নামে এক লোকের মুদির দোকান। সেখান থেকে আব্বা বাকিতে প্রয়োজনীয় সওদা নিতেন। মাসের শেষে শোধ দিতেন। আমরা ভাই বোনেরা ঠাকুরদার দোকান থেকে ছোটদের লোভনীয় লজেন্স, চকলেট, বাদাম নিয়ে আসতাম ঠাকুরদা আমাদেরকে খুব আদর করতেন যা ভুলবার নয়। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ১৯৬৮ সালে । দেখা হয়নি। উনি চলে গিয়েছিলেন ভারতে। এই সময় আমার মেঝো দুলাভাই ড. আমমেদ আলী চৌধুরী ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন ও আমার বড় ভাই ড. শফিক আহমদ খান ময়মনসিংহের বিভাগীয় বনকর্তা ছিলেন। সেই সুবাদে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছিল।

ঠাকুরদার দোকানের পাশেই ছিল 'উপেনদার খলিফার দোকান। ঈদের সময় তাড়াতাড়ি কাপড় বানিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা উপেনদাকে খুব বিরক্ত করতাম। তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করতেন। এই সময় আব্বার অফিসে সহকারী কমিশনার (প্রবেশনার) হিসেবে যোগদান করেন জনাব খান এ আলম খান ও জনাব আবদুল হাই। জনাব খান-ই আলম খান চুনতির বিখ্যাত অজি উল্লাহ খান বংশের নাতি হওয়ায় আব্বারও নাতি, আবদুল হাই আব্বার পালিত কন্যার জামাই, চিত্তরা কাজী বাড়িতে ওনার বেগমের এর জন্ম। জন্মের পরে ওনার আম্মার অসুস্থতার কারণে আমার আম্মার দুধে উনি পালিত হন। তাই উনি আমাদের আপা ও হাই সাহেব দুলাভাই ছিলেন। ঘটনাক্রমে দুজনই আব্বার অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। খানে এ আলম খান ও আব্বা কবিরউদ্দিন আহমদ খান দুজনই সাইন করতেন কে এ খান দিয়ে। এই নিয়ে অনেক সময় হাসাহাসি হতো। কিছুদিন পরেই আব্বা অবসর নেন। খান এ আলম মামা ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও মেম্বার বোর্ড অব রেভিনিউ হয়ে ও হাই সাহেব দুলাভাই চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হয়ে অবসর নেন।

ফিরে আসছি ক্ষুদে ছাত্রজীবনের কথায়। দুই ভাই প্রতিদিন মহাকালি পাঠশালায় যেতাম। বাসার সামনের গেট পার হয়ে কিছুদূর যেতেই রেল লাইন, লেভেল ক্রসিং পার হওয়ায় সময় প্রায়ই শানটিং রত রেল ইঞ্জিন কাছাকাছি এসে যেত, হুশ করে একটি বাঁশি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে দৌড় দিতাম ঢোলা হাফপ্যান্ট প্রায়ই খুলে যেত।।

আব্বার অফিস, জেলা প্রশাসন ও আদালত স্কুল থেকে মাইল খানেক দূরে। মিষ্টির লোভে প্রায়ই আব্বার অফিসে স্কুল ছুটির পর বাসায় না গিয়ে সরাসরি চলে যেতাম। সহজে ঠিকানা চিনতাম পানির ট্যাংক; রাস্তার মাথায় একটি পানির ট্যাংক ছিল। সেখান থেকে সামনে বাঁক নিয়ে কিছুদূর গেলেই অফিস। অফিসে ঢুকতেই প্রথমে আব্বা মৃদু বকা দিতেন বাসায় আম্মার কাছে না গিয়ে এখানে কি?' পিয়ন ২ প্লেট বড় বড় মিষ্টি নিয়ে আসলে আমাদের ইচ্ছা পুরণ করে বাসায় ফিরতাম।

আম্মাসহ আমাদের সবাইকে নিয়ে আব্বা রাত্রে খরগোশ শিকারে বের হতেন। দোনলা বন্দুকের সঙ্গে টর্চ ফিট করা থাকতো। মুক্তাগাছা পর্যন্ত রাস্তার পাশ কন্টকাকীর্ণ ছিল। আব্বা হঠাৎ আমেরিকান উইলিস জিপ থেকে টর্চের আলো ফেলতেন পাশের জঙ্গলে চোখ জ্বলতে দেখা যেত-সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার। মুক্তাগাছার মণ্ডা তখনও বিখ্যাত ছিল। মাঝে মাখে সেখানে জিপ থামতো। অতি সাধারণ গ্রাম্য ঘরবাড়ি, মণ্ডা তৈরি করতে খাঁটি দুধের ছানা দিয়ে সেখানকার কারিগররা,

একটা খেলেই পেট ভরে যেত। পাশেই ছিল কোন হিন্দু জমিদারের কাঠাল বাগান। আব্বা না দেখে মতো আমরা দু-ভাই বড় কাঠাল চুরি করে গাড়ির পিছনে তুলে নিয়েছিলাম। মেঝ ভাই সাইদ অহমদ খান ডিএফও হামিদ সাহেবের অধীনে বন বিভাগের চাকরিতে ঢুকেছেন। কর্মস্থল রসুলপুর ও মধুপুর প্রচুর বনমোরগ ও ছোট হরিণ পাওয়া যেত। আম্মাও বেড়াতে খুব পছন্দ করতেন। একবার ব্যবস্থা হয় যমুনা নদীতে কয়েকদিন থাকার, বিশাল বজরায় ২ রাত। যাওয়ার পথে বিখ্যাত পোড়াবাড়ির চমচম আস্বাদন। বজরার বড় বড় মাছ ও খাঁটি দুধের ক্ষীর, স্বাদের কোনো তুলনা নেই।

প্রায়ই যোগেশ কাকাবাবু দীনেশ কাকাবাবুদের বাসায় বেড়াতে যেতাম। ওনারা আব্বার অধীনে বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা ছিলেন। বিভিন্ন আকারের মিষ্টি আনা হতো। আমরা দুই ভাই ও ছোট বোন লোভাতুর চোখে খাওয়ার জন্য বসে থাকতাম। আম্মুর কঠিন শাসন-একটার বেশি খাওয়া যাবে না। প্লেটে দেওয়া সবটা খেয়ে সাবাড় করা অভদ্রতা। মনের কামনা অপূর্ণ থেকে যেত, দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আম্মার ওপর কঠোর অভিমান করে ফিরতাম। আম্মার আবার সিনেমা দেখারও শখ ছিল। আশে পাশে দুটা সিনেমা হল। অলকা হল ও ছায়াবানী হল। আব্বা আগে থেকেই টিকেট করে রাখতেন ড্রাইভার এসে নিয়ে যেত।

অসুখ বিসুখের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আব্বা নিজেই করতেন। জ্বর হলেই জিজ্ঞাসা করতেন, পায়খানা হয়েছে কিনা? যদি বলি না। তাহলেই সর্বনাশ। তৎক্ষণাৎ কুইনাইন ও লিভার সল্ট প্রয়োগ। এই পাউডার এক চামচ এক গ্লাস পানিতে দিলেই ফুলে উঠে। অত্যন্ত নোনতা স্বাদ সংগে সংগে অনেকবার যাতায়াত। জ্বরের চোটে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি নাই তার ওপর মরার উপর খাড়ার ঘা।

আমি একটু ভীতু স্বভাবের ছিলাম। কিন্তু বড় ভাই ও সহপাঠি এস এ খান সবকিছুতে বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করতেন। জিপে কোনদিকে যাওয়ার সময় উনি অবশ্যই ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে এক পা বের করে বসতেন ও মানুষ দেখলে হাত নাড়তেন। এটা নাকি ফ্যাশন। তখনকার চিত্রাভিনেতা রহমান এভাবে পা বের করে বসে দুর্ঘটনায় পা হারিয়েছিলেন। আব্বার অফিসের সম্মুখে চমৎকার ফুলবাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকতো। পুলিশ পাহারায় ফুল ছেঁড়া নিষিদ্ধ ছিল। আমরা দু' ভাই হেঁটে যাওয়ার সময় আমি পুলিশ দেখে ভীত। উনি কিন্তু অবশ্যই একটি বড় গোলাপ ছিড়বেন ভাবটা এমন আমি কালেক্টর সাহেবের ছেলে সুতরাং নো প্রবলেম।

১৯৫২তেই আব্বার অবসর। বিশাল বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন। অনেক মিষ্টি, চমচম, রাজভোগ ইত্যাদি। দুটা রাজভোগ খেতে গিয়ে আমার ফ্যাশন দুরস্ত ভাই কর্তৃক আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। মর্মবেদনা অনেকদিন জারি ছিল। দুয়েকদিন পরেই বাড়ির দিকে যাত্রা। রাত ২ টায় ময়মনসিংহ রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু, পরের দিন কোন সময়ে ভৈরব হয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছি ঠিক মনে নেই। পথে অনেকবার আম্মাকে বলতে শুনেছি, আমরা কালেক্টর সাহেবের পরিবার সুতরাং সাবধান।

চট্টগ্রামে আব্বার ঠিকানা অনেক। তা সত্ত্বেও তিনি বাইরে থেকে অসলে একটা ঠিকানায়ই বেশি থাকতেন। ১৮ নম্বর শুকুর আলী মুন্সেফ লেইন রুমঘাটা দেওয়ান বাজার। বলতে গেলে রুমঘাটা একটি চুনতির পাড়া। এটার প্রতিষ্ঠাতা পূর্বে উল্লিখিত চুনতির হযরত শুকুর আলী মুন্সেফ। এছাড়া আমাদের দাদা-বড় দাদার বংশধরেরা এখানে থাকেন আম্মার মেঝভাই আব্বার বড় শ্যালক মরহুম জনাব মাহবুবুর রহমান জেলা রেজিস্ট্রার, এখানেই বাড়ি করে থাকেন। ওনার বেগম সাহেবা আবার আব্বার ছোট বোন। তাই আব্বা স্টেশন থেকে সরাসরি ঘোড়ার গাড়িতে আমাদের সবাইকে নিয়ে হাজির। মামা ও ফুফু স্বাদরে গ্রহণ করেন। যতদূর মনে পড়ে কয়েকদিন ছিলাম এবং বেশির ভাগ ইলিশ মাছ খেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত চুনতিযাত্রা।

আব্বাসহ চারভাই কলকাতাসহ সারা অবিভক্ত বাংলায় লেখাপড়া বা চাকুরি করতেন। মেঝো চাচা জনাব তাহের আহমদ খান চুনতির বাড়িতে স্থায়ীভাবে থেকে সবার পক্ষ থেকে জমিদারি সহ যাবতীয় সম্পদ দেখাশোনা করতেন। তৃতীয় চাচা জনাব কামালউদ্দিন আহমদ খান এজি অফিসে চাকরি নিয়ে ধানমন্ডিতে ঘর করেন। চাচী 'জননী সাহসিকা' বেগম সুফিয়া কামাল গৃহীনি হিসেবে এই সময় জীবন কাটান। চাচা জনাব জামালউদ্দিন আহমদ খান কো অপারেটিভ অফিসার ছিলেন ও ধানমন্ডিতেই পাশাপাশি বাড়ি করেন। সর্বকনিষ্ঠ চাচা জনাব ড. ইস্রায়ীল খান কুমিল্লার এ্যানিমেল রিসার্চ ইনিস্টিটিউশনের প্রধান হিসেবে অবসর নিয়ে ঢাকার মিরপুরে স্থায়ী হন।

আব্বা স্বপরিবার চুনতি আসবেন এই খবর মেঝো চাচাকে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম তখনকার বটতলী রেল স্টেশন থেকে রেলে দোহাজারী যাবে। দোহাজারীতে নৌকায় শঙ্খ নদী পার হয়ে লক্কর ঝক্কর মার্কা বাসে করে চুনতি। মেঝো চাচা দলবল নিয়ে ডেপুটি বাজারে আব্বাকে স্বাগত জানিয়ে মাইল খানেক কর্দমাক্ত হাঁটা পথে পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চুনতির বাড়িতে নিয়ে আসেন। বর্ষা ছিল হাঁটু পর্যন্ত কাপড়

চোপড় কাদা হয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকতেই একটি বাঁশঝাড়সহ পচা নর্দমার পাশে একটি টিনের ছাওয়া দোতলা মাটির গুদাম ঘরে আমাদের ঠাঁই। আব্বা অত্যন্ত সৎ লোক হওয়ায় কোনো দালান কোঠা তৈরি করতে পারেন নাই। তাই এই মাটির ঘরেই আপাতত; থাকার ব্যবস্থা। চাচা লোকজন দিয়ে হালচাষ করতেন। তাই পুরুষ মহিলা অনেক লোক দেখলাম। চারদিকে উঠান ভর্তি কাদা ও গরুর গোবর। ধানের আঁটি ও খড়ের গাদা। বিশ্রি দুর্গন্ধ অবস্থা। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কোথায় এসে পড়লাম! যাক আস্তে আস্তে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। বেশ কিছুদিন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা চাচা-ই করলেন। পাশাপাশি আর এক ঘরে চাচাও থাকতেন। দাদির বয়স তখন শ'খানেক। টকটকে ফর্সা, শাদা চুল, কুঁজো হয়ে হাঁটতেন মনে হয় যেন পুতুল হাঁটছে। নিজের চাষের ধান থেকে চাল করে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা চাচার। দিনরাত বৃষ্টি। রোদের দেখা নাই। ধান শুকানো অসম্ভব। কাজের মেয়েরাই প্রথমে ধান কাটে ও মাড়াই করে সেদ্ধ করে আবার শুকায়। তারপর ঢেকিতে চাল বের করে। খুবই অভাবের দিন ছিল। তাই অনেক মহিলা শুধু কাজের বিনিময়ে ভাত খাওয়ার জন্য থেকে যেত। তাদের দেখে দেখে ছেলে মেয়ারাও এভাবে লালিত পালিত হতো। লেখা পড়ার বালাই নাই। একটু বড় হলে গরুর রাখাল। এভাবে আর কতদিন চাচার উপর? সুতরাং আব্বা বিকল্প ব্যবস্থা চিন্তা করলেন। আব্বা সাহেব মানুষ। ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজি জীবন কাটিয়েছেন এখানেও তেমনটা দরকার। পাশেই আব্বার চাচাতো ভাই জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ডেপুটি সাহেবের একটি কোটাবাড়ি একতলা খালি পড়েছিল। আব্বা ঐ বাড়িতে উঠে গেলেন। বলতে গেলে বাড়িটি ছিল রাজবাড়ি। সামনের দিকে বড় উঠান সহ দুটি পুকুর শান বাঁধানো ঘাট, পাশে ফুলের বাগান। অনেক গুলি কামরা আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সামনে বড় হলঘর। একপাশে আব্বার কামরা ও লোকজন নিয়ে বসার খোলাঘর। খোলাঘরের একপাশে আব্বার ইজিচেয়ার ও পাশে লেখাপড়ার জন্য চেয়ার টেবিল। সামনে দুই পাশে মেহমান ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য মর্যাদা অনুযায়ী চেয়ার ও টুল। আব্বার অনেক বন্ধু ছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিকারি। শাহ সাহেব কেবলার বাবা জনাব সৈয়দ আহমেদকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। শেষ বয়সেও উনি আব্বার সঙ্গে শিকারে যেতেন। পুতুন মিয়াজীকে আব্বা বুড়া পল্লান ডাকতেন ও লোহাগাড়ার জনাব তৈয়বউল্লাহ সওদাগর ও শিকারি বন্ধু ছিলেন। অবসর সময় এসে গল্প করতেন। এছাড়া জনাব সামিউন চৌধুরী, মৌলানা ইজাদ আলী, এস্তফা খান, নুরুল হুদা-নজির, ইব্রাহিম, আমির হোসনে, নুর হোসেন, আশু আলী প্রমুখ সবাই বন্ধু ও সহকারি ছিলেন। বুড়া পল্লান এর নাতি মোস্তাককে আব্বা হাতে কলমে শিকার শিক্ষা দেন। সে সবসময় আব্বার কাছে কাছে

থাকতো। শিকারের সব প্রস্তুতিতে ও ফিরে এসে বন্দুক পরিস্কার করে জায়গা মতো রেখে দিত। আজও বেঁচে আছে এই মোস্তাক একজন নামকরা শিকারী। শীতের দিনে বসার ঘরের পাশে আব্বার একটি ফায়ার প্লেস' থাকতো। সন্ধ্যায় সেখানে আগুন ধরানো হতো। শিকারিরা আসতো-অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব ও আগুনে গরম করে পিঠা ও চা খাওয়া চলতো। মামা জনাব ইসলাম খান কলকাতায় ব্যবসা করতেন। চুনতি আসলে আব্বার জন্য নানারকম উপহার নিয়ে আসতেন, পাশে বসে গল্পগুজব করে চা খেয়ে যেতেন। আব্বা একটা বন্দুক ওনাকে দিয়েছিলেন।

স্কুল জীবন

আব্বার এতজন ছেলের মধ্যে কেউই মাদ্রাসায় পড়ে নাই। তাই ওনার একান্ত ইচ্ছে ছিল আমি মাদ্রাসায় পড়ে একজন মৌলানা হয়ে বংশের সবার জন্য নাজাতের উসিলা হই। মাদরাসার সুপার প্রখ্যাত আলেম জনাব আবু তাহের নাজের এর সঙ্গে দেখা করে আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয় এয়াজ দোহম শ্রেণিতে। এর পূর্বে আমি আরবিতে কোনো লেখাপড়া করি নাই বলতে গেলে একদম নিরক্ষর, 'আলিফ-বে' ও চিনি না। শুধু 'আহমদ বদ্দা নামে আত্মীয় গৃহশিক্ষক আমপারা মুখস্ত করিয়েছিলেন। ক্লাসে আরবি বই পড়তেও লিখতে না পারায় প্রচুর মার খেতাম। মাদ্রাসার হুজুররা তখন মার দেয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কয়েকটি বাঁশের কাঠি একত্রিত করে মারের চোটে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতো। দুঃখের বিষয়-কেউ কোনদিন চিন্তা করেন নাই যে ছোটকাল থেকে যাকে অক্ষর জ্ঞান-ই দেওয়া হয় নাই সে আরবিতে লেখা পড়া চালিয়ে যাবে কিভাবে? তাহলে ভুলটা কোথায় এবং কার? আমিও চিন্তা করতাম আব্বাও যখন এডামেন্ট তখন কত মার খেতে পারি দেখা যাক। একটার ওপর আরও কয়েকটা পাঞ্জাবি পরে ক্লাসে যেতাম যাতে মারটা ভিতরে একটু কম লাগে। পরীক্ষা নেওয়া হতো বটগাছ তলায় ছাত্ররা গোল হয়ে বসতো খাতা কলম নিয়ে। আরবি লিখতে জানে এরকম এক সহপাঠির সঙ্গে বিড়ি খাওয়ার চুক্তিতে পাশে বসে তার খাতা নকল করতাম। আরবি লিখতে হয় বাংলার উল্টো দিক থেকে আমি কিছুই বুঝতাম না, বাংলা লেখার মতো একপাশ থেকেই লিখে যেতাম- দেখে সবাই হাসতো। কি লিখেছি তাও জানি না। তবুও দুই শ্রেণি পাশ করে নহুম পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মৌলানা আহমদুল্লাহ হুজুরের মার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিতে বাধ্য হলাম। মাদ্রাসার যাওয়ার পথে ছিলো দারোগা সাহেব জ্যাঠার লিচু বাগান। সেখানে ক্লাসে ফাকি দিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। যেদিন ক্লাসে উপস্থিত হই সেদিন

আর রক্ষা নাই। সুদে আসলে উসুল। অন্ধ এক ক্বারী সাহেব ছিলেন, ক্বেরাত শিখাতেন, একবার নিজে পড়ে শোনাতেন, তার মত সুর করে ছাত্রদেরকে পড়তে হতো। আমি কিছুই পারতাম না। আদেশ হতো-তাকে ধরে আন'। তিন চারজন মিলে পাজকোলা করে আমাকে ধরে ক্বারী সাহেব হুজুরকে ধরিয়ে দিত। কোন বেত নাই শুরু হতো লাথি আর কিল। এভাবেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তারপর প্রিয় ছাত্রদেরকে বলতেন একটা বিড়ি ধরিয়ে দে-ত।

বলা বাহুল্য এসব নৃশংসতা বর্তমান যুগে কল্পনারও বাইরে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাই এসব সংস্কৃতি থেকে এখন অনেক দূরে। একদিন সাহস করে আব্বাকে এসে বললাম আমি আর মাদ্রাসায় পড়বো না। হয় আমাকে স্কুলে ভর্তি করেন না হয় মেরে ফেলুন। আব্বা আর বাড়াবাড়ি করেন নাই। প্রশ্ন হলো কোন ক্লাসে ভর্তি হবো। আমি নিজেকে হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু আব্বা নিজ ইচ্ছায় আমাকে মুন্সেফ বাজারের ভাঙাচোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তাও আবার ক্লাস ফোরে। এতে আমার দু বছরের শিক্ষা জীবন নষ্ট হয়। প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন লিকলিকে লম্বা কালো নোয়াখালীর লোক। জনাব এস্তফা আলী মিয়ার বাড়িতে থাকতেন। ফুকু নামে ওনার মেয়েকে পড়াতেন। ফুকু খুব সুন্দরী ছিল আমার এক ক্লাস ওপরে ফাইভে পড়তো। হেড মাস্টার খুব ভাল অংক জানতেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি অংকে খুব খারাপ ছিলাম। তাই আব্বা বলেছিলেন কিছুদিন ওনার কাছে প্রাইভেট পড়তে। পারিশ্রমিক পাঁচ টাকা আমার মারফৎ পাঠিয়ে দিলেন। গিয়ে দেখি উনি বাড়ি গেছেন কিছুদিন ছুটিতে। টাকা আমার কাছে থেকে যায়। ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করি কি করা যায়? সবাই বলে নোয়াখাইল্লা মাস্টার কখন আসে ঠিক নাই, চল আমরা টাকাগুলি সবাই মিলে খেয়ে ফেলি। তখন পাঁচ টাকায় অনেক কিছু পাওয়া যেত। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসেন হেড স্যার। আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করার পরে ধরা পড়ে যাই। আব্বা মহৎ ব্যক্তি প্রথমেই ক্ষমা করেন- আবার পাঁচটি টাকা দেন। ২য় শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীতে আমার মামা শ্বশুর মৌলানা শাহরিয়ার। তারপরে জনাব ফৌজুল আজিম খান ও বড় হাতিয়ার কালু স্যার, উনি আমাদের 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' পড়াতেন। তাই আমরা ওনাকে 'ভূতের বাপ' ডাকতাম। শাহরিয়ার মামা ইংরেজি পড়াতেন। হি ইজ এ ফারমার 'সে হয় একজন কৃষক' এভাবে। জনাব ফৌজুল আজিম খান সংস্কৃতি মনা লোক ছিলেন। তার পরিবারে অনেক বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। ওনার আব্বা মরহুম জনাব বদরুল কবির খান বিখ্যাত কাওয়াল ছিলেন। ব্যান্ড সঙ্গিত শিল্পী নকিব খান ওনার নাতি। ফৌজুল আজিম খান আমাদের গান শিখাতেন।

সাতকানিয়া থেকে স্কুল ইনসপেক্টর পরিদর্শনে আসলে গান গেয়ে তাকে মাল্যবরণ করতে হতো। তিনি খুশি হয়ে একদিন ছুটি দিয়ে দিতেন। এই কাজের জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এমন একটা গান বাছাই করে আমাকে গাইতে বলা হয় যে গান আমি কোনদিন শুনি নাই। পরে ফৌজুল আজিম স্যার নিজে গানটি গাইতে আরম্ভ করেন ও আমি মুখে মুখে শিখে নিয়ে দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করি।

এই সময় আমরা চার ভাইবোনের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিলো বিখ্যাত প্রাইমারি শিক্ষক জনাব সিরাজুল হক ওরফে সিরু মাস্টারকে। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। উনি আমাদের ক্লাসের পড়া তৈরী করে দিতেন। রান্নার জন্য রাখা হয়েছিলো খালেককে। মজার মজার রান্নার জন্য খালেক ছিল সিদ্ধহস্ত। তার বেতনও ত্রিশ টাকা মাসিক। কোনো সংসার ছিলো না তাই আমাদেরকে নিয়ে পড়ে থাকত। আমাকে আব্বা বলে ডাকতো ও আমার বড় ভাইকে ডাকতো জ্যাঠাব্বা, বোন বুলুকে কোলে নিয়ে "বুলুরে দূরে নইদ্দম বিয়ারেহায় হায়রে সুর দিয়ে গান করতো।" এসব ছিল সবার হাঁসির খোরাক।

অন্যান্য বাইরের কাজের জন্য একই ত্রিশ টাকা বেতনে ছিল খলিল। আমরা বলতাম খইল্লা বদ্দা'। প্রত্যেকদিন পাহাড় থেকে এক বোঝা বাঁশ অথবা লাকড়ি আনতো। সারা বছর লাকড়ি সংস্থান বাড়ির চারদিক বাঁশের বেড়া দেওয়া। রাত্রে আমাদেরকে কিসসা শুনানো ছিলো তার কাজ। সন্ধ্যার পরে এক একজন পিড়ি নিয়ে আমরা গোল হয়ে তার সামনা সামনি বসতাম। এমরান-চন্দ্রবান-ভেলুয়া সুন্দরী ইত্যাদি কিসসা সে মুখস্ত বলে যেত। আমরা মগ্ন হয়ে শুনতাম আব্বা ভাত খাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া পর্যন্ত।

আমাদের বাড়ির পাশে একটা পরিত্যাক্ত ভিটা ছিল। সেখানে এক দরিদ্র পরিবার ভাঙাচোরা বাঁশের ঘরে থাকতো। বুড়া ও সম্পূর্ণ অন্ধ আহমদর রহমান মুন্সি- কিসের মুন্সি আমরা জানিনা-লোকে বলতো এককালে অঁ-দ-র-ন মুন্সি জাদরেল শিকারি ছিলো। সঙ্গে ছিল ছেলে আলী ও মেয়ে পুতুনী। এই দুজন ছিল আমাদের খেলার সাথী। অবসর সময় সেখানেই কাটাতাম। চারপাশে ছিল আম কাঁঠাল ও পেয়ারার গাছ। ফল আসতো। বর্তমান জমানায় ঐসব ফল বাজারে বিক্রি করে ছোট খাটো গেরস্থ পরিবার চলে যাবে। কিন্তু তখন এসবের কোনো চাহিদা ছিল না খাওয়ার লোক নাই। তাই বাজারে এসব বিক্রি বাবদ বুড়ার কোনো রোজগার ছিল না। তাই প্রায় সময় স্বপরিবার উপোস দিত। একমাত্র ছেলে আলী কোনো কাজ করতোনা। মাঝে মধ্যে কোন কোনো বাড়িতে সবজি খেতে জল সেচ দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে যেত; আমরাও তাকে সাহায্য করার

জন্য সঙ্গে যেতাম। বিনিময়ে পাওয়া যেত জনপ্রতি একবেলা বিনি ভাত ও এক পেকেট বিড়ি। আলীকে কাজের জন্য তার বাবা বেশি চাপ দিলে সে বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে যেত। তিন চারদিনের আগে ফিরে আসতো না। তার বাবা সারা রাত '-আলী, ও- আলী বলে চিৎকার করতো। ফিরে আসলেই আব্বা জিজ্ঞেস করতেন এতদিন কোথায় ছিলিরে ব্যটা? সে বলতো 'কৈ এর ঝিরির পুলের নীচে থাকতাম। তিনটা আমলকি ও তিন খোশ পানি হলো একবেলার খাবার, এ ভাবেই সে বেঁচে থাকতো। তার ছিলো ঝাঁকড়া বাবড়ি চুল, আর তাগড়া মোচ, সবসময় মুখে থাকতো নিজের খেতের তামাক পাতা দিয়ে তৈরি চুরুট তার মতে ওসব নাকি পৌরুষ এর চিহ্ন। এদিকে তার বাবা-মা ও ছোটবোন প্রায়দিনই উপবাস। উঠানে একটা বড় কাঁঠাল গাছ ছিলো। বড় বড় কয়েকটি কাঁঠাল ধরতো। ভাতের বিকল্প হিসেবে এ কাঁঠালগুলি ছিল বেশ কিছুদিনের খাদ্য সংস্থান। এমনকি একটা কাঁঠালকে কেটে কেটে বেশ কয়েকবার খাওয়া হতো। আমরা মাঝে মধ্যে আম্মার চালের মজুদ থেকে কিছু চাল চুরি করে দিয়ে আসতাম।

এত কষ্টের মধ্যেও মুন্সি জ্যাঠা ছিলেন সদাহস্যময়। অনেক গল্প করতেন। শিকারে গিয়ে কিভাবে বাঘের সামনে পড়েছিলেন বাঘের গর্জন হুবহু নকল করে শোনাতেন।

একবার নাকি পাহাড়ের ভিতর অনেক দূরে কয়েকজন মিলে বিশাল আকারের সাম্বার হরিণ মেরেছিলেন। পাশেই ছিলো মগপাড়া। তারাও শিকারের সঙ্গী। এখন এত মাংস বাড়িতে আনবেন কিভাবে? এই সমস্যা, কেউ কেউ প্রস্তাব করে অর্ধেকটা কেটে মগদের দিয়ে দেওয়া হোক। মুন্সি জ্যাঠা আপত্তি করে বলেন 'মাথার মজা মাথায়, রানের মজা রানে' সুতরাং সবটা কেটে প্রথমে মিলিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ভাগ করে একাংশ মগদের দেওয়া হোক।

বেচারা একা একা সারারাত এবাদত করতেন। সন্ধ্যার সময় সামান্য ইফতার করে খেয়ে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। মসজিদে মাইক-সাইরেন কিছুই ছিলো না। নিজের কোনো ঘড়িও ছিলো না। অন্ধ মানুষ তাই সেহেরীর অনেক আগেই সামান্য যা আছে-আম-কাঁঠাল পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। আমরা যখন সেহরি খেতে উঠি তখন মুন্সি বাড়িতে খবর নাই।

এই ছিল তখনকার দিনের দারিদ্রের চিত্র। ১৯৬০ এর দশকের কথা সারা গ্রামে জন সংখ্যা ছিল খুব কম; ঘর বাড়িও ফাঁকা ফাঁকা। চালের সের ছিলো ছ' আনা। লোকে বলে তখনকার দিন ভাল ছিলো। দ্রব্যমূল্যের দাম কম ছিল। কিন্তু দাম কম থাকলে কি! কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ ছিলো না। গ্রামের মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল পরিবারে ভাতের বদলে বা সামান্য মজুরীতে কাজ করা ছাড়া উপায় ছিলো

না। ইরি বারো তখন দেশে আসে নাই; দেশিয় জাতের ধানের উৎপাদন দিয়ে খরচ পোষাতোনা- কোন ঋণ সুবিধাও ছিলনা। মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া সুদের হার ছিল চড়া। এসময় বাঁশখালীসহ উপকূলীয় এলাকায় ঝড় জলোচ্ছাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক পরিবারে চুনতি এসে আশ্রয় নেয়। ফলে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র প্রকট আকার ধারণ করে। আমাদের অবস্থা ও এত ভালো ছিলো না; তবুও আম্মা যথা সম্ভব সাহায্য করতেন। একবেলা ভাত খাওয়ানোও তখন ছিল বড় রকমের সাহায্য।

আব্বার পেনশনের টাকা পেতেন মাসিক তিনশ টাকা। এই টাকায় আমাদের লেখাপাড়ায় খরচসহ সংসারের খরচ সামাল দিতে হতো। এছাড়া সবসময় মেহমান থাকতো। শিকারি বন্ধুরা আসত, দ্রব্যমূল্য কম ও টাকার মূল্যমান বেশি ছিল বলেই জানে রক্ষা। এক টাকার কাঁচা বাজার ছিল তিন দিনের হাঁট। একটা বড় মোরগ তিন টাকা। বড় মাছ ও প্রায় একই রকম। তাছাড়া শিকারের মাংস হাড়ি থেকে শেষ হয়না। খাল-বিল-ডোবা -নালা ছিল মাছে ভরা। একটু কষ্ট করলেই ঝুড়ি ভরা মাছ- সারা বছর খাওয়া যেত। মুন্সেফ বাজারের 'রেজা আলীর দোকান থেকে আব্বা বাকিতে সওদা আনতেন- মাঝে মাঝে পরিশোধ। তবে পেনশনের টাকায় সংকুলান না হওয়ায় কিছু টাকা বাকি থেকে যেত। রেজা আলী বদ্দা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগুলি হজম করতেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আগে আব্বা যৎসামান্য পৈত্রিক জমি বিক্রি করে সমস্ত কর্জ শোধ দিয়ে যান। ক্লাস ফোর ফাইভে আমি ফাস্ট হই। ফাইভে তখন সরকারি বৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম ছিল। তখনকার এক হিন্দু হেড মাস্টার আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড বয়দের সাতকানিয়া নিয়ে যায় বৃত্তি পরীক্ষার টেস্ট দেওয়ার জন্য। টেস্টে আমি একজনই পাশ হই। ফাইনাল দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের কালেজিয়েট স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার এক আপার বাসায় থাকতাম। দুলাভাই প্রত্যেকদিন আমাকে আট আনা দিতেন। তাতেই দুপুরের খাওয়া চলতো। একদিন হিন্দু স্যারের সঙ্গে 'সাবিত্রি পাইচ হোটেলে খেয়েছিলাম। পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরলাম ভগ্ন হৃদয়ে। কারণ যথারিতি আমি অংকে ভালো করতে পারিনি। ফলও হয়েছিলো প্রতিকূল।

১৯৫৭ সালে চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার পিছনে যার অবদান বেশি তিনি হলেন আমার মামা জনাব ডাক্তার নুরুল আলম। এলাকায় উনি কালু ডাক্তার নামে পরিচিত। আমরাও কালু মামা ডাকতাম। সম্পর্কে আমার আম্মার চাচাতো ভাই। এক সময় তিনি চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। অবসরে বাড়িতে চলে আসেন- সামাজিক কাজ কর্ম শুরু করেন। উনি বিনা পয়সায় গরিব দুঃখীদের-চিকিৎসা করতেন। এমনকি নিজের

পয়সায় ওষুধও দিতেন। রাত বিরাতে ডাক দিলে চলে আসতেন। ওনাদের পৈত্রিক ভিটা মুন্সেফ বাড়ি। সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় ঐ ভিটায় উনি ঘর করার মত জায়গা অবশিষ্ট ছিলো না। আমার আব্বার নিজস্ব বন্দোবস্তকৃত ১৫ কানি পাহাড় আব্বা স্বেচ্ছায় নাম মাত্র মূল্যে কালু মামাকে দিয়ে দেন। যেহেতু তিনি ছিলেন আব্বার একান্ত প্রিয় ও অনুগত শালা। সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই পাহাড় ও বিদ্যালয় পাহাড় পাশাপাশি। বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি দান করেন আমার জ্যাঠা জনাব এস্তেফাজুর রহমান খান এর পরিবার। পাশাপাশি চুনতি হাকিমিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার জমিও একই পরিবারের দান কৃত।

চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ডা. নুরুল আলম, তাঁকে সহায়তায় এগিয়ে আসেন সর্ব জনাব এস্তফা আলী মিয়া, ইসহাক মিয়া, কাজেম মাস্টার প্রমুখ। জনাব ইউনুস খান, জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর কাচারি ঘরে কিছুদিন ক্লাস চালানো হয়। এই সময় আমার আব্বাও কিছুদিন ইংরেজি ক্লাস নিতেন।

আমি ১৯৬৫ সালে চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করি। ভর্তির সন তারিখ ঠিক মনে নেই। সবার প্রত্যাশা ছিলো আমিই প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন পাবো। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফুফাতো ভাই জনাব আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন; সবাই যাকে বাদশাহ মিয়া নামে চিনতো, তিনি তখন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সচিব ছিলেন, আমাকে ক্লাসে গিয়ে বলতেন 'তোকে অবশ্যই ফার্স্ট ডিভিশন পেতে হবে। আমরা তোকে একটা সিভিক রিসেপশন দেব'। ফার্স্ট ডিভিশনের জন্য তখন ৬০ শতাংশ নাম্বার প্রয়োজন হতো। এ নাম্বার তোলা অতিশয় দূরহ ব্যাপার ছিলো। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। একজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে অংক মুখস্থ করেছি। তবুও ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। শুধুমাত্র ৫টা নাম্বার কম পাওয়ায় আমি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলাম। তবুও ঐ বৎসর পর্যন্ত আমার রেকর্ড ছিলো সর্বোচ্চ।

আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই তখন কোনো বিদ্যালয় ভবন ছিলো না। ছিল শুধু একটা লম্বা আকৃতির ছনের ছাওয়া মাটির গুদাম ঘর। বৃষ্টি হলেই দেয়াল চুয়ে পানি পড়তো, আমাদের বই খাতা ভিজে যেত। ভাঙাচোরা বেঞ্চ-এ বসে পায়ের নিচে কাঁদা জমে যেত। এক সময় একপাশের দেয়াল ভিজে ধ্বসে পড়ে যায়। ভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হয়নি। ক্লাস সিক্স থেকেও যথারীতি ১ম স্থানে ছিলাম। পরে আমার ভাতিজা হামিদ উল্লা আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে- একবার আমি ফার্স্ট, আরেকবার সে- এভাবেই এস এস সি পর্যন্ত চলতে থাকে।

প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু যোগেশ চন্দ্র পাল। ইংরেজিতে ছিল স্যারের অসাধারণ দক্ষতা; ইংরেজিতে আমার ফাউন্ডেশন তার হাতের গড়া। তিনি ডিকটেশন দিতেন, আমি হুবহু মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখতাম। এছাড়া আরও একজন শশাঙ্ক বাবু ছিলেন বি এ (অনার্স) ইংরেজি। কিন্তু তিনি ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে গল্প বেশি করতেন। সুব্রত বাবু ও জনাব মোহাম্মদ হোসেন প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে আমৃত্যু বিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন। দপ্তরী ছিলেন খোরশেদ বদ্দা। মেজাজি মানুষ-মাঝে মাঝে চটে যেতেন। তবুও দরদ ছিলো বিদ্যালয়ের জন্য।

বাদশাহ ভাই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই পরিচালনা পরিষদে এসেছিলেন- ওনার মতো ব্যক্তিত্বের এই কাজে আগ্রহ দেখানো অবশ্যই দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা প্রমুখ ওনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা তার সাথে বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন ও মঞ্চে বাদশাহ ভাইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে এই গ্রাম্য স্কুলে ওনার মত একজন অভিভাবক থাকা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয় বাদশাহ্ ভাইয়ের অনুরোধে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ও বাগান করার জন্য ৩ একর খাস জমির বন্দোবস্ত দেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তিনি প্রথম বিদ্যালয়ের পাকা দালান করেন। তারপর থেকে থামেনি চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা।

আমার বড় দুলাভাই জনাব গজনফর আলী মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ কিছুদিন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সংক্ষেপে স্বাক্ষর করতেন 'জি এ এমডি সলিমুল্লাহ, বি এ.বিটি। ইংরেজিতে পারদর্শী ও প্রায় সময় ইংরেজিতেই কথা বলতেন। দেখতেও খুব সুপুরুষ ছিলেন। লম্বা ফর্সা পোশাকে-আশাকে দুরস্থ। ওনার ছোটভাই ছিলেন অধ্যাপক আজমত উল্লা, চট্টগ্রামের কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রী মাহফিল আরা আজমত ছিলেন নাসিরাবাদ মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ।

ওনার বাড়ী চুনতির পাশাপাশি গ্রাম রশিদের ঘোনায়; বাবা আসাদুল্লাহ ডেপুটির প্রতিষ্ঠিত জমিদারি-ই ছিলো ওনাদের গর্বের বিষয়। দোতলা বিশাল পাকা দালান অনেকগুলি সাজানো কক্ষ, আমার বড় আপা এ ঘরেই প্রায় সময় থাকতেন। সামনে ঘেরা দেওয়া ঘাসের লন'সহ বিশাল উঠান। একপাশে ধানের গোলা আর এক পাশে বড় বড় দুধেলা গাই। উঠান পেরোলেই সামনের বড় পুকুর। এছাড়া পাশে ও পিছনে রয়েছে বড় বড় মাছ ভর্তি বড় বড় পুকুর। মাছ ধরার জন্য জাল ও লোকজন তৈরি-ই থাকতো। আমরা তখন ছোট। বড় ভাই ড.

শফিক আহমদ খান, ডাক নাম মানিক, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরবর্তীতে বায়োক্যামিস্ট্রি থেকে মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন।

'আমার শালা মানিক এসেছে' মানিকদাকে আসতে দেখলেই দুলাভাই এভাবে ডাক দিতেন। আমরাও সঙ্গে থাকতাম। বিশাল কাতাল মাছ ধরত আজির-ন, খাসি জবাই করতো মুনির আহমদ, অনেক আত্মীয় স্বজনসহ ভোজ চলতো। বাড়ি ভর্তি লোকজন জমিদারি হালচাল ধানের দিনে উঠান থেকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত ধানে ভর্তি; কিছু চিকন ধান আব্বার জন্য পাঠাতেন। প্রজারা লাইন ধরে কাঁধে করে ধান বয়ে আনতো।

দুলাভাই চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু করে দোহাজারী জামীজুরী, পটিয়া রাহাত আলী স্কুল হয়ে চন্দ্রঘোনা পেপার মিল হাই স্কুল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সর্বশেষ পেপার মিল হাই স্কুলেই কিছুদিন টিকেছিলেন। আপাসহ স্কুলের বাসায় থাকতেন। জমিদারি মেজাজের কারণে উনার এক জায়গায় বেশিদিন চাকরি করা সম্ভব হয় নাই। পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় প্রায়ই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসতেন। বাকি জীবন জমিদারি হালচালে বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

স্কুলে পড়াকালীন আমরা প্রতিবছর একবার চাচার 'ঘোনা'তে বেড়াতে যেতাম। ঘোনা অর্থাৎ খামার বাড়ি। মেজ চাচা জনাব তাহের আহমদ খান মাইজ্জা মিয়া নামে বেশি পরিচিত ছিলেন চুনতিতে। চুনতির নাছিরুদ্দিন ডেপুটির পরিবার ও জমিদারি তিনিই প্রতিনিধিত্ব করতেন কারণ বংশের অন্যান্যরা সবাই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ছিলেন। মাইঝ্যা মিয়া জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এই কারণে যে সাধারণ জনগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি সবসময় জড়িত থাকতেন। প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা করতেন, সালিশ-বিচারও করতেন।

ওনার 'ঘোনা' ছিলো চুনতির বাড়ি থেকে অনুমানিক পাঁচ মাইল দক্ষিণে "জাঙ্গালিয়া" নামক জায়গায়। চারিদিকে গহীন অরণ্য ঘেরা ধানি জমি। জমির মাঝে মাঝে গোদা, প্রয়োজনে জমিতে জলসেচ দেওয়ার জন্য বাঁধ দিয়ে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা। ছোট ছোট টিলার উপর কয়েকটি বসত ঘর ও ধানের গোলা। চাচা প্রায় সময় সেখানেই থাকতেন। ওনার ঘরটা ছিল ইটমাটি নির্মিত দোতলা, উপরে তিনি থাকতেন। নিচে বুড়ী, রান্নাবান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। পাশেই আবার গোসল খানা ও কাঁচা পায়খানা ও ছিল তবে সাধারণত সবাই গোদায় গোসল করতো। অনেক শ্রমিক সবসময় কাজ করতো। তাদের জন্য একটি খোলামেলা বাঁশের ঘর ছিলো।

নিরাপত্তার জন্য বন্দুকসহ থাকতেন আহমেদ বদ্দা ও কাদের। আর একটা টিলার উপর চাচা ছোট একটা বাংলা টাইপ ঘর করেছিলেন আব্বার থাকার জন্য। নাম দিয়েছিলেন 'সাহেবের বাংলো'। আব্বা সপরিবারে ওখানে গিয়ে উঠতেন প্রতি বছর শীতকালে। মনোরম পরিবেশ- টিলা-পাহাড়গুলির পরে বিস্তীর্ণ ধানি জমি ও তারপরে সরকারি রিজার্ভ বনাঞ্চল। অপূর্ব সুন্দর এই বনাঞ্চল ছিলো প্রাকৃতিক বিশাল গর্জন ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও বন্য প্রাণিতে ভরপুর। আব্বার সঙ্গে শিকার পার্টি থাকতো- আমির হোছেন, মনির আহমদ, আশু আলী ও অন্যান্য। জনপ্রতি একটা করে বন্দুক। রাত্রে হাড় কাপানো শীত। কাঁথা, কম্বল কিছুতেই শীত মানানো যেতো না, তাই আগুন জ্বালানো হতো। আগুনের পাশে খড়ের গাদা করে শুয়ে পড়তাম। খুব ভোরে শিকারিরা বের হয়ে পড়তো। খামারের আশে পাশেই বন-মোরগ ও মথুরার ঝাঁক। এক গুলিতে দু-তিনটা পড়ে যেত। খালেবিলে প্রচুর মাছ, ওমদা খাতুন মাছ ধরে আনতো। চাল থাকতো চাচার স্টকে,সুতরাং কিছু তৈল, মরিচ মসলা ছাড়া কিছু কিনতে হয় না। নানারকম পিঠা করা হয়, আগুনের পাশে ঝাল মাংস দিয়ে ভাপা-পিঠার কোনো তুলনা নাই। আম্মা খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। উনি রাত্রে খামারে বসে গ্রামোফোন বাজাতেন। আমাদেরকে বলতেন 'তোমরা ঘরের ভিতর থেকে বের হবে না। কারণ গানশোনার জন্য বাইরে হাতি আসতে পারে। তিন চারদিন থেকে সপ্তাহ পর্যন্ত মহা আনন্দে কাটতো। দিনগুলো ভালো ছিল। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীর উৎপাত ছিলো না। আমরা ভাইবান ছাড়াও আরও অনেক পুরুষ মহিলা এই গহীন বনে রাতের পর রাত কাটানো এডভ্যাঞ্চার ও কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণও বটে। ফিরে আসার দিনতো খালি হাতে ফেরা যাবে না। কিছু সঙ্গে নিতে হবে। আশেপাশে প্রতিটা পাহাড়েই ছোট ছোট মায়া হরিণ পাওয়া যায়। একপাশে শিকারিরা লাইন ধরে বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকে। অন্য পাশ থেকে লোকেরা হই হই করে তাড়া করে। হরিণ দৌড়ে বন্দুক ধারীর সামনে পড়তেই গুলি। দুয়েকটা হরিণ সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরা।

যাওয়া আসার জন্য এমদাদ এর টেক্সী ভাড়া করা থাকতো। ভাড়া একশো করে দু'শো টাকা। এমদাদ আধুনগর এর লোক, ভাড়ার জন্য এলাকায় ঐ একটি টেক্সিই পাওয়া যেত। তা-ও অনেক আগে থেকে বলে রাখতে হতো। গাড়িটার চেহারা ছিলো 'রোলস রয়েস'টাইপ, রিংয়ের চাকা। অনেক পুরানা- ইঞ্জিন ও বডি উভয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ রেডিয়েটর ফেটে পানি পড়ে যেত। তাই পথের পাশে অনেক সময় দাঁড়িয়ে সাবান দিয়ে ফুটো বন্ধ করে আবার পানি দিয়ে তারপর চলতো। তবুও এই গাড়িসবেধন নীলমনি, চাহিদা অনেক। আধুনগর আমিরাবাদ

দোহাজারি ট্রিপ মারতো। একবার ট্রিপ থেকে আসলে একবার মেরামত প্রয়োজন হতো। দক্ষিণ দিকে আমাদের পাহাড়ি এলাকায় গাড়ি চালাতে এমদাদ ভয় করতো। রাস্তার অবস্থা ছিলো খুব খারাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের ইট বিছানো রাস্তা। তখন পর্যন্ত সংস্কার হয় নাই। মাঝে মাঝে বিরটা বিরাট গর্ত। একবার আসাবধনতায় গর্তে পড়ে ঐ গাড়ি আবার গর্ত থেকে তুলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তার উভয় পাশে জঙ্গল ঠেলে গাড়ি চালাতে হতো। অনেক সময় রাস্তার পাশে হাতি দাঁড়িয়ে থাকতো। ফেরার আগে চাচার খামারের মাইল দুয়েকের মধ্যে আমরা মগপাড়া দেখতে যেতাম। আজিজনগর ও গয়ালমারা মগপাড়া। আজিজনগর নাম হয়েছে এই এলাকায় আজিজ বিড়ি কোম্পানি বিড়ি ফ্যাক্টরি করার পর। এর আগের নাম 'তীরত্তলা'। আম্মা ও বোনরাসহ কয়েক মাইল মগ পাড়া ঘুরে আসতাম। মগরা আমাদেরকে পেয়ে খুব খুশী হতো ও নানারকম উপহার সামগ্রী দিতো; তাদের হাতে বুনা কাপড়, বিনি চাল, ঠাণ্ডা আলু, মক্কা জোয়ারী, মোরগ ইত্যাদি। মেয়েরা সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে রং মেখে অভ্যর্থনা জানাতো ও আমাদের মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরে বলতো তোমরা কত সুন্দর। বলা বাহুল্য তখন মগদের প্রাচুর্য ছিলো, জুমচাষ করে ফসল ফলাতো। পশুপালন ও তাঁত বুনান করে রোজগার করতো। পরবর্তীতে নানান কারণে বিশেষ করে ডাকাতের উপদ্রবে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এমনকি অনেক পাড়া ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরও অনেক গভীরে দূরবর্তী দুর্গম পাহাড়ে চলে যায়।

আব্বার বার্ষিক পারিবারিক ভিজিট ছাড়াও আমরা দুই ভাই প্রায়ই চাচার ঘোনায় যেতাম স্কুল ছুটির ফাঁকে। চাচা আদর যত্ন করতেন। সুইলার মা রান্না করে খাওয়াতো-চায়ের কাপগুলো ছিলো ভাঙ্গা। পুদিনা ও গুড় দিয়ে একপ্রকার অদ্ভুদ চা তৈরি হতো। গোদায় গোসল করা ছিলো মহা আনন্দের ব্যাপার। কাচের মতো স্বচ্ছ ও বরফ শীতল পানি। নামাজের সময় হলে চাচা নীচে নেমে আজান দিতেন। তারপর দোতলায় উঠে নিজেই ইমামতি করতেন। পিছনে আমরা কয়েকজন মুকতাদি। চাচা প্রায়ই 'আল-কারিয়াতু মাল-কারিয়া পড়তেন। এখনও যে কেউ সুরাটি পড়লে বা আমি নিজে পড়লেও চাচার কথা মনে পড়ে এবং চোখের সামনে ওনার খামার বাড়ির একটা সার্বিক চিত্র ফুটে উঠে।

আর এক আনন্দের দিন ছিলো 'ঘোনা থেকে বার্ষিক ধান বাড়িতে নিয়ে আসার দিন। ঐ দিন রীতিমতো উৎসব বাড়ীর সব ছেলে মেয়েদের জন্য। ধান কোনদিন আনা হবে আগ থেকেই খবর নিতে থাকতাম। নির্ধারিত দিনে খুব সকালে পায়ে হেঁটে 'ঘোনায় পৌঁছে যেতাম। লোহাগাড়ার জনাব শরিয়তউল্লাহ

মুন্সির দুটি ভারি ট্রাক ছিলো। একটিকে বলা হতো বড় জঙ্গি আরেকটিকে ছোট জঙ্গি। ট্রাক দুটি ভারি বেঝো নিয়ে চলতে পারতো। রাস্তাও ছিলো উঁচু নিচু ও ভাঙ্গাচোরা। চাচা লোক পাঠিয়ে এই দুটির একটি ট্রাক ভাড়া করতেন। যথাসময়ে ট্রাক ঘোনায় পৌছে যেত। লেবারদের সঙ্গে আমরাও কাজে লেগে যেতাম। ধানের স্টক ট্রাকে তুলতে বেশ সময় লেগে যেত। তারপর বাড়ীর দিকে রওয়ানা, পাঁচ মাইল রাস্তা। আসতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা লেগে যেত। রাস্তার গর্তে একবার চাকা পড়লে উঠাতে অনেকক্ষণ, উপরের দিকে উঠতে ইঞ্জিনের অঁ-অঁ আওয়াজ ও নৌকার মত দুলুনীতে আমরা ধানের টালের উপর বসে খুব আনন্দ পেতাম। বিকালের দিকে গাড়ি বাড়ি এসে পৌঁছাতো। কাঁচা রাস্তা ভারী ট্রাক বাড়ি পর্যন্ত ঢুকতনা। আবার লোকজন দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধান গোলাজাত করে কাজ শেষ করতে রাত হয়ে যেত।

চাচার নিজস্ব খামার বাড়িসহ বিশাল জমি জমা। পৈত্রিক জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য অনেক লোকজনের দরকার হতো। চাচা কিছু সময় বাড়িতে কাটাতেন ও বাকি সময় ঘোনায় থাকতেন। চাচীর ভাই দুইজন সৈয়দ মামা ও হাফেজ মামা সর্বক্ষণিক কাজে থাকতেন। তাদেরকে চাচা জমির কিছু অংশও দিয়েছিলেন। তাদের ছেলেমেয়েরা চাচীকে কাজের সহযোগিতার জন্য চুনতিতে থাকতো। কাগজপত্র ঠিক রাখা, খাজনা আদাদ-প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন ছিলো রামকানাই মুহুরীর।

চাচী সার্বক্ষণিক চুলার গোড়ায় বসে থাকতেন। বাড়িতে মজার খাবার তিনি নিজে তৈরি করতেন। সহকারি থাকতো অনেক। এছাড়া যত মেহমান যখন যে আসে চাচী তাৎক্ষণিক খাবার এর ব্যবস্থা করতেন। মুখে শুধু বলতেন একটু সবুর করো। এখনি দিচ্ছি। চাচী কাউকে না খাইয়ে যেতে দিতেন না। আবার গরিব লোকজন আসলে খাইয়ে একটি চালের পোটলা দিয়ে বিদায় করতেন। খুব অভাবের সময় ছিলো তাই দলে দলে মহিলারা চাচীর আশেপাশে সবসময় ঘুর ঘুর করতো। চাচীকে বকতে বা বিরক্ত হতে দেখিনি। শহর থেকে আত্মীয় স্বজন আসলে লোকজন শুটকি খেতে চাইতো; চাচী তৎক্ষণাত শুকটির মরিচ রান্না করে দিতেন। বলতে গেলে চাচী দুনিয়াতে সরাসরি একজন বেহেশতি আল্লাহর বান্দা ছিলেন। যার জীবনে শুধু সেবাই দিয়ে গেছেন। নিজের কোনো চাহিদা ছিলো না। আমরা ছোট থাকতে, আবার আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোট থাকতে চাচীর ও দাদীর যথাক্রমে আদরের কোনো কমতি ছিলো না। ভিটা বাড়ির ফলমুল সব আমরা খেয়ে সাবাড় করতাম। চাচী এসব দেখে হাসতেন, বলতেন ছেলেমেয়েরা, নাতি-নাতরীইতো খাবে-এত খুশির কথা।

১৯৬৫ সাল। আমি এস এস সি পরীক্ষার্থী। এই সময় দাদী মারা গেলেন। দাদা অনেক আগেই মারা যাওয়ায় দাদার ঘরে দাদী মহিলা সেবকদের নিয়ে থাকতেন। সামনে আর একটি দাদার কাছারি ঘরও খালি পড়ে ছিলো। আব্বা ভাড়াটিয়া বিল্ডিং ছেড়ে দিয়ে পৈত্রিক এই টিনের ছাওয়া আধা পাকা ঘর দুটিতে চলে আসলেন। আব্বা দাদার কাছারি ঘরে একা উঠলেন। আমরা সহ আম্মা ভিতরের দাদীর ঘরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। আমরা দুই ভাই একবোন তখনও স্কুলে; কোনো বিদ্যুৎ ছিলো না সন্ধ্যায় হারিক্যান জ্বালিয়ে পড়তে বসতাম। আব্বা বাইরের ঘরে থাকলেও খাওয়ার টেবিল ছিলো ভিতরে। আম্মা সারাদিন ভিতর বাড়ি সংলগ্ন রান্নাঘরে রান্না করতেন ও সময় মতো আব্বার খানার টেবিল সাজিয়ে দিতেন আব্বা মোশা আলীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে আসতেন। মোশা আলী নীচে বসে থাকতো। আব্বার খাওয়া শেষ হলে মোশা আলী নীচে বসে খেত। রিজিক যাই থাকুক আম্মা আব্বার সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতেন। প্রায় সময় আব্বার শিকারি বন্ধুরা আব্বার সঙ্গে খাবারে অংশ নিতেন। আম্মা কিছুটা বিরক্ত হলেও সামনে কিছু বলতেন না। আব্বা বাইরে চলে গেলে না শুনে মতো হালকা বকাঝকা দিতেন। আব্বা ভিতরের দিকে আসলে আম্মা একদম চুপ।

আমার এস এসসি পরীক্ষা আসন্ন। এই অবস্থায় মানিকদা খবর পাঠালেন হাতির খেদা দেখতে যাওয়ার জন্য। এমন বিরল সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সুতরাং কক্সবাজার যেতেই হলো। মানিকদা তখন কক্সবাজারের সহকারি বন সংরক্ষক (দক্ষিণ) ও খেদা অফিসার। কক্সবাজার থেকে অফিসের গাড়িতে হোয়াইকং রেস্ট হাউজে রাত যাপন। সেখান থেকে আনুমানিক দশ মাইল ভিতরে হাতি খেদা। লোকেরা জানালো হাতি একেবারে নিকটে খেদায় ঢুকার উপক্রম হয়েছে। কাছে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না বা কোনরকম আওয়াজ করা যাবে না। হেঁটে ঘুরাঘুরি করলাম। বড় বড় গাছ দিয়ে বিশাল একটা ঘের তৈরি করা হচ্ছে। ঘের থেকে সামনের দিকে মাইল খানেক লম্বা একটি সরুপথ সৃষ্টি করা হয়েছে উভয় পাশে বড় বড় গাছ দিয়ে। হাতিকে মাস খানেক আস্তে আস্তে তাড়া করে এই সরুপথে প্রবেশ করানো হয়। এরপর পিছু নেওয়া অভিজ্ঞ লোকজন পিছন থেকে বাজি ফোটাতে আরম্ভ করে। হাতির পাল এক দৌড়ে ঘের এর মধ্যে পৌঁছে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই উপরের মোটা রশি দিয়ে বাঁধা গেটের রশি কেটে দিলে গেট বন্ধ হয়ে হাতির পাল আটক হয়ে যায়। ঘেরের দেয়াল এর সঙ্গে লোহার বল্লম লাগানো থাকে। হাতি ধাক্কাধাক্কি করলে বল্লমের গুতা লাগে। এতে ধাক্কা ধাক্কি

কমে যায়। এছাড়া বাইরে পাহারায় থাকা লোকজনের হাতেও বল্লম থাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

এর বেশি আর কিছু দেখার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। যেহেতু হাতি একেবারে কাছে সবার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়। রেস্ট হাউজে ফিরে আসলাম এবং ঐ রাতেই হাতির পাল খেদায় ঢুকলো। রাত্রে অনেক হৈ-চৈ। গোল্লা ফোটানোর আওয়াজও হাতির চিৎকার শুনলাম। পরের দিন আমার পরীক্ষার কারণে ফিরে আসতে হলো। আরও অনেক উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হলাম।

পরে মানিকদার কাছে গল্প শুনেছিলাম মাসখানেক পর খেদা থেকে হাতিগুলি বের করা হয়। তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান গিয়েছিলেন দেখতে সঙ্গে আরও অনেক দেশি বিদেশি অতিথি। হাতির ঘের এর চারপাশে উঁচু করে মাচা বাঁধা হয়। মাচার উপরে উঠে সবকিছু দেখা যায়। গেটের সামনে একটা অভিজ্ঞ পোষা হাতি দাঁড় করানো হয়। ঘের থেকে একটা হাতি বের করে পুরনো হাতি দুটার মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়। এর পূর্বে অনেক দিন অভুক্ত রেখে হাতিগুলোকে দুর্বল করে ফেলা হয় যাতে বের করার সময় বেশী দুষ্টামী না করে। তারপরও পোষা হাতির দুটার মধ্যে থাকা অবস্থায় এমনভাবে উভয় পাশ থেকে চাপ দেওয়া হয় যাতে নুতন হাতিটা আর কোন নড়াচড়া করার শক্তিই-ই থাকে না। এরপর সেটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। তারপর এভাবে এক একটা করে পর্যায়ক্রমে বের করা হয়। হাতির খেদা তখনকার দিনে সরকারী অনুমোদন নিয়ে নির্ধারিত কর পরিশোধ সাপেক্ষে করা হতো। হাতিগুলি দোহাজারীতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো ও সেখানে প্রশিক্ষন শেষে বিক্রি করা হতো। খেদায় হাতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে লাভ-লোকসান নির্ভর করতো। সেবার উনিশটা হাতি ধরা পড়েছিল এবং ভাল লাভ হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। আমার দাদা ও আমার চাচা পর পর দুবার চুনতিতে হাতি খেদা করেছিলেন বলে জানা যায়, ঐ এলাকাটা এখনও 'খেদার পথ' নামে পরিচিত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় দুই বার-ই কোন হাতি ধরা পড়ে নাই; বড় অংকের লোকসান গুনতে হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল সাতকানিয়া কলেজ। পরীক্ষার তিনদিন আগে বাড়ি থেকে রওয়ানা হলাম বই পুস্তক ও একটি হারিকেন নিয়ে। আব্বার এক আপনজন রিককাওয়ালা ছিল, নাম হাঁছি মিয়া। তার রিকশায় আমাকে সাতকানিয়া আমার এক চাচাতো বোনের (শাকেরা আপা) কাছারী ঘরে পৌঁছে দেয়- পাঁচ টাকা ভাড়া আব্বা দিয়েছিলেন। এছাড়া সপ্তাহ দশদিনের খাওয়ার

জন্য আমাকে ত্রিশ টাকা দেওয়া হয়। থাকা ফ্রি। একজন লোক চুক্তিতে প্রতিবেলায় ১২ (বার) আনা মূল্যে ভাত দিয়ে যেত। এটা নাকি অনেক বছর ধরে তার ব্যবসা। শীত কাল। দিনে দুবেলা পরীক্ষা। এক সপ্তাহে শেষ। মানবিক বিভাগ প্র্যাক্টিকাল নাই। খুব সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম। মাইল খানেক হাটতে হতো। রিকশার পয়সা নাই। দুপুরের এক ঘণ্টা অবসরে নামাজ পড়ে নিতাম। কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হলেও অর্থের হিসাবে না মিলায় বিরত থাকতাম। বিকাল বেলা পরীক্ষা শেষ করে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। হল সুপার ছিলেন বাবু অসিত কুমার লালা। টকটকে ফর্সা বিশাল শরীর। কক্ষে প্রবেশ করলে আমরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। প্রশ্ন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্নে একটু চোখ বুলিয়ে উত্তর লেখা শুরু করতাম। তিন ঘণ্টা সময় মনে হতো ফুরুৎ করে শেষ। শেষ করেই একবারে মাথা তুলতাম। আশেপাশে অনেকে নকল করতো। একজন আমার খাতা দেখেদেখে লিখতো। আমি পাতা উল্টাবার সময় সে হাত চেপে ধরে অনুনয় বিনয় করত আর একটু সময় দেওয়ার জন্য যাতে সে উত্তরটা সম্পূর্ণ করতে পারে। পরীক্ষা শেষে আমাকে অনেক ধন্যবাদ। সে নাকি কয়েকবার ফেল করে। এবার আশা করছে, আমার খাতা দেখে লিখতে পারলে অবশ্যই পাশ করবে। যাহোক যথারীতি পরীক্ষা শেষ করে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরলাম। একই রিকসাওয়ালা গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। ত্রিশ টাকা হাত খরচ থেকে আরও কিছু বাচিয়ে এনেছিলাম। রেজাল্ট বের হতে তিনমাস লাগবে। অখন্ড অবসর। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। প্রায় সময় শিকারে চলে যেতাম।

কলেজ জীবন

রেজাল্ট হওয়ার পর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তির আবেদন করলাম। পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হয়ে গেলাম এইচএসসি মানবিকে। অধ্যক্ষ ছিলেন সুসাহিত্যিক আবু রুশদ মতিন উদ্দিন। শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলার মমতাজ উদ্দিন স্যার। তিনি এখনও হাস্যোজ্জ্বল একজন তরুণ মনে হয়ে টেলিভিশনে দেখতে। তিনি একাধারে গল্পকার, নাট্যকার, নির্মাতা, অভিনেতা আরও অনেক কিছু। আমি স্যারের ছাত্র হতে পেরে এখনও গর্ভবোধ করি। স্যার আমাদেরকে চন্দ্রনাথ সরজুর প্রেমের গল্প পড়াতেন। স্যার সব সময় গম্ভীর মুখে, কোন হাসি নেই চেহারা দেখলে আমরা ভয় পেতাম।

বাংলায় আরেকজন ছিলেন আ.ফ.ম সিরাজুদ্দৌলা চৌধুরি স্যার। স্যার অত্যন্ত সুদর্শন ও পোষাক আশাকে কেতাদুরস্ত ছিলেন। উনার এক ছাত্রীকে প্রেম করে বিয়ে করেন। অত্যন্ত দুঃখজনক চট্টগ্রাম কলেজে থাকতেই তিনি খুব কম বয়সে মারা যান। ম্যাডাম ছিলেন হাছিনা আপা। একদিন উনার ক্লাসে এক ছাত্র মেয়েদের দিকে ফুল ছুঁড়ে মারে। ম্যাডাম খুব ক্ষেপে গিয়ে কার কার কাছে ফুল আছে সব দিয়ে দিতে বলেন। অন্যথায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাক্রমে আমার পকেটেও কয়েকটা গোলাপ ফুল ছিল। ভাল মানুষি করে আমি ফুল জমা দিলাম বলে আমি নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় মর্মাহত হলাম। শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রমাণে আমি অব্যহতি পেলাম। ইংরেজিতে দু'জন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন আবু আহমদ স্যার ও রণজিৎ স্যার। দুজনেরই পড়ানোর নিজস্ব স্টাইল ছিল। আবু আহমদ স্যার মাংকিস্-প পড়ানোর সময় অভিনয় করে দেখাতেন। রনজিৎ স্যার অত্যন্ত সু উচ্চারণে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজি তখন ছিল শিক্ষার মাধ্যম তাই ইংরেজিকে-ই সবাই বেশি গুরুত্ব দিত, সব বিষয়ে লেকচার থেকে শুরু করে কথোপকথন ও পরীক্ষা সবই ইংরেজি তে হতো। স্বভাবতই সাধারণ ইংরেজি শেখা হয়ে যেত। লজিকে ছিলেন অবনী মোহন দত্ত। বিভাগীয় প্রধান খুব-ই পন্ডিত ব্যক্তি। তবে অতি বুড়ো ও দাঁত পড়ে যাওয়ায় কথা বুঝা যেত না। মুক্তিযুদ্ধে তিনি মারা যান। এছাড়া ছিলেন আব্দুর রফিক স্যার ও রুকনুজ্জামান স্যার। দুজন সুদর্শন, ফিটফাট থাকতেন। রুকনুজ্জামান স্যার একটু শ্যামলা টাইপ ছিলেন। বোর্ডে লিখার সময় উনার সারা গায়ে চক পড়ে সাদা হয়ে যেত। এদিকে উনার খেয়ালই নেই। সাইকোলোজি বানান লিখতেন-পিসি-চল-যাই। শুনেছিলাম উনি নাকি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছিলেন সুঠাম সবল মস্তোফা স্যার। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিলেন। হারুনুর রশিদ স্যার রোগা পাতলা ছিলেন। কথা বলার সময় ঘনঘন জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিতেন। অর্থনীতিতে ছিলেন সাতকানিয়ার নামকরা জাঁদরেল প্রফেসর আবু সুফিয়ান, উনি ছিলেন বিভাগীয় প্রধান ওনার ক্লাস খুব কম পেয়েছি। বেশি ক্লাস নিতেন সিকান্দর খান স্যার ও আব্দুর রশীদ নেগাহবান স্যার। দুজনই খেটে পড়াতেন এবং ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। সেকান্দর স্যার পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ও অবসরের পর এখনও আল্লাহর রহমতে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি।

আমাদের সহপাঠি ও রোল নাম্বার ওয়ান ছিল সৈয়দ শফিক উদ্দিন আহমদ, ছাত্র ইউনিয়নের কলেজ শাখা ইউ এস পিপি প্রধান ছিলেন শফিকুল মওলা। শফিক উদ্দিন আমাদেরকে সংগঠনের দিকে টানতো; আমি ব্যক্তিগতভাবে

রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না; পড়াশুনাকেই প্রাধান্য দিতাম। আরও কয়েকজনের নাম মনে পড়ে মোজাহের, নুরুল আলম, সালাউদ্দিন জঙ্গি প্রমুখ। মেয়েদের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না; রোল নাম্বার ৪২১-এর দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হতো- স্লিম বডি - মার্জিত চেহারা। রং পরিষ্কার। এই পর্যন্তই। অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নই উঠে নাই।

থাকতাম মানিকদার বাসায়। ফরেস্ট হিল-এ আ-বা- ফ্রি। মানিকদা তখন কক্সবাজার থেকে বদলী হয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম উত্তর মহকুমার বনকর্মকর্তা হিসাবে। ফরেস্ট হিল'-এর উত্তর পুর্ব কোণায় একটি একতলা পাকা ঘর। সামনে কোন রকম একটি জিপ চলার মত রাস্তা। তারপরেই পাহাড়ের ঢালুতে অনেক গভীর খাদ। রিটেনশন ওয়াল দেওয়া থাকলেও মনে হয় ভারী বৃষ্টি হলে যে-কোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। একই বাসায় আবার দু'জন অফিসার। মধ্যে পার্টিশন দিয়ে মানিকদার কলিগ থাকতেন সপরিবার। উনি দক্ষিন মহকুমার বনকর্মকর্তা ছিলেন। নাম মহিউদ্দিন; আমি মহিউদ্দিন বদ্দা ডাকতাম ও মিসেসকে ভাবি ডাকতাম। দুটা মেয়ে ছিল। সুলতানা ও রেহানা। একই ঘরে দুই পরিবার হওয়ায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে। ঐ ভাবির ডায়াবেটিস ছিল; অধিক মিষ্টি খেত। তাই অল্প বয়সে মারা যান। বাসায় আমাদের অংশে ছিল এক কোনায় একটি ছোট বেডরুম, থাকতেন মানিকদা ও ভাবি, বাচ্চা-কাচ্চা তখনও হয় নাই। এর বাইরে একটি খাট ফেলে আমি থাকতাম। একটি বাথরুম। দুই দরজা- এক দরজা দিয়ে ঢুকলে অন্য দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করতে হতো। আমার খাটের সঙ্গে লাগানো একটি হার্ডবোর্ড দিয়ে পার্টিসান করে বাকি অংশ ড্রয়িং রুম। ডাইনিং রুম ও কিচেন- দুই ঘরে ভাগাভাগি- বলতে গেলে খুব-ই করুণ অবস্থা। মাঝে মাঝে ভাবির আম্মু বেড়াতে আসতেন। খুব রুচিশীল এবং স্নেহশীলা মহিলা। খুব আদর করতেন, আমি খালাম্মাকে আমার বিছান। ছেড়ে দিয়ে ড্রয়িং রুমে বিছানা করে থাকতাম। অবসরে খালাম্মাকে হাসির গল্প শুনাতাম- উনি খুব হাসতেন- সেই সুবাদে ভাবীও আমাকে পছন্দ করতেন।

রান্না করতো শমশু মিয়া অর্ডারলী; আমি তাকে শমশু মিয়া 'আঁড়ালী' ডাকতাম। একদিন সে মাংসের সঙ্গে আস্ত একটি তেলাপোকা রান্না করে; সে দিন-ই বাসায় মেহমান ছিল ও মেহমান ভাবীর পাতে উঠে ঐ তেলাপোকা। বেচারী অনেক্ষণ বমি করে। বড় ভাই খুবই অপ্রস্তুত হন ও 'আঁড়ালী'কে বকাঝকা করেন। ঐ। বেচারাও মর্মাহত হয়ে পরের দিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তখন রেডিও টেলিভিশন ছিলনা- ছিল ট্রানজিস্টার ও রেকর্ড প্লেয়ার। মানিকদার রেকর্ড প্লেয়ার ছিল ডানসেটে টেম্পো আর একটা ন্যাশনাল ট্রানজিস্টার এগুলি আমি-ই প্রায় সময় ব্যবহার করতাম।

ফরেস্ট হিল' এর দক্ষিণ পাশ দিয়ে নামলে নজির আহমদ চৌধুরী রোড হয়ে আন্দরকিল্লা, উত্তর পাশ দিয়ে নামলে রাজপুর লেইন দিয়ে ব্যন্ডবক্স, ওহাদাদা রেনকোতে কাপড় ধোয়া দিতাম, এটাই আন্দরকিল্লার মোড়। এখান থেকে দুই রাস্তায় চট্টগ্রাম কলেজ এ যাওয়া যায়- সিরাজউদদৌলা রোড হয়ে চন্দনপুরা অথবা কেবি আব্দুস সাত্তার রোড হয়ে গুড সাহেব রোড পার হতেই গণি বেকারীর মোড় ও কাজেম আলী হাইস্কুলের পরেই চট্টগ্রাম কলেজ। মোটামুটি এক মাইল রাস্তা হেঁটেই যাওয়া যায়। পয়সার অভাবে হেঁটে যাওয়া আসা-ই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ফরেস্ট হিল থেকে আর একজন অফিসারের মেয়ে চট্টগ্রাম কলেজে যাওয়া আসা করতেন। ছায়া আপা। বিএ ক্লাসে পড়তেন। আমাকে রাস্তায় দেখলে রিকশায় তুলে নিতেন। ঐ ছায়া আপা আবার আমার ফুফাতোবোন রুকু আপার বান্ধবী ছিলেন।

কলেজে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক মিটিং মিছিল হতো। তৎকালীন আয়ুব খান সরকার ও তার মৌলিক গণতন্ত্রকে তুলোধুনো করা ইউ এস পিপি এর শফিকুল মওলা ও ছাত্রলীগ সংগঠন যান্ত্রিক এর আশরাফ খান উভয়ে অনলবর্ষি বক্তা ছিলেন। শফিকুল মওলা ভাই কোথায় কেমন আছেন জানি না; আশরাফ খান ভাই কয়েক বছর আগে আমার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে কলেজ ফাংশান অনুষ্ঠিত হতো- গান, কবিতা আবৃত্তি, অনর্গল বক্তৃতা আরও কত কিছু, অনেক রাতে বাসায় ফিরতাম।

ভাবির বড় বোন খুকু আপা সপরিবার চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের বাসায় থাকতেন। দুলাভাই ডাক্তার আলতাফ উদ্দিন আহমদ তখন প্রিন্সিপাল। তিন মেয়ের মধ্যে হেনা খালা.... বড়, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা: শরিফ এর স্ত্রী। কলেজ ছুটির পরে প্রায়ই ঐদিকে যেতাম, একটু খিদাও থাকতো- হেনা খালা আদর করে অনেক কিছু খেতে দিতেন। ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় 'বুড্ডা' আমার সমবয়স্ক ছিল। তার সঙ্গে ঘুরতাম ও চাইনিজ খেতাম। খুকু আপা ও দুলাভাই দুজন-ই কৌতুক প্রিয় ছিলেন। আমার বড় ভাই কালু মিয়া দেখতেও ছিল কালো; উনি দুলাভাইকে একবার বলেছিলেন- "আমরা তো ছাতি মার্কা মানুষ"- দুলাভাই খুব হেসেছিলেন ও সেই থেকে তাকে ছাতি মার্কা ডাকতেন। কালু ভাই এমনই গান করতেন-

"মরা বাঘে খাকরে বন্ধুরে ফুয়ানা খালত ডুফক
নরম নরম জাত কদুর কেঁড়া বন্ধে ফুঁড়ি মরক
বন্ধে ভারাইলরে।"

আপারা সবাই হেঁসে লুটোপুটি। এই বাসায়-ই মানিকদার প্রথম সন্তান বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: নিয়াজ আহমদ খান রানার জন্ম হয়।

এক বর্ষনমুখর রাত্রে ফরেস্ট হিল থেকে মানিকদা ও ভাবী চলে যান - আমি একা ছিলাম। সকালে টেলিফোনে আমাকে সুখবর দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন

যথাসময়ে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করি। এবার অনার্সে ভর্তি হবার সংগ্রাম। ইতোমধ্যে মানিকদা ঢাকায় বদলি হয়েছেন ট্যাকনিক্যাল অফিসার হয়ে বন মন্ত্রনালয়ে, প্রথমে বাসা ভাড়া করেছিলেন মালিবাগ মোড়ে; কিছুদিনের মধ্যে সরকারী বাসা পেয়ে যান বেইলী রোডে- টিনের ছাওয়া ইটের দেয়াল ফ্লোর পাকা। অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে ভাগাভাগি এক পাশে এক ড্রয়িং রুম- এক বেডরুম- এক বাথরুম, সামনে পিছনে খোলা বারান্দা- পিছনের বারান্দায় বেড়া দিয়ে তৈরী কিচেন। আগের মতই ড্রয়িং রুমের এক পাশে খাট ফেলে আমি থাকতাম। ড্রয়িং রুম বেশ বড়। এক পাশে থাকা এক পাশে খাওয়া তার পরে মেহমান বেশী হলে ফ্লোরিং করা যেত। এমনকি গরমের দিনে সামনের বারান্দায়ও পাটি বিছিয়ে আরামে ঘুমানো যেত। সামনে ফুলের বাগান ও তারপরে চলাচলের রাস্তা। মোটামুটি ছিমছাম পরিবেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম তখনকার নিয়ম অনুযায়ী তিন বিষয়ের এক গ্রুপে। পাশ করলাম দুই বিষয়ে ইংরেজি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান চয়েস এর প্রশ্ন সমান। বিরাট ভুল করলাম যার জন্য সারা জীবন খেসারত দিতে হলো। আমরা বংশগতভাবে অংকে খারাপ, রাজনীতিতেও নাই- ইংরেজিতে ভাল। আব্বা ব্রিটিশদের কাছে শিক্ষিত ইংরেজীতে অনার্স, ভাইবোনরা ইংরেজিতে সবাই ভালো। বাড়ীতে ইংরেজীর পরিবেশ। মানিকদাও স্বভাবতই আমাকে ইংরেজী পড়তে চাপ দিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ইংরেজীকে ভয় পেলাম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সহজ পাঠ্য হিসাবে জীবন সঙ্গী করে নিলাম। এটা ১৯৬৭ সালের কথা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নাজমুল আবেদীন (সিনিয়র) এছাড়াও আর একজন অধ্যাপক নাজমুল আবেদীন (জুনিয়র) ছিলেন। পরে প্রধান হয়ে আসেন অধ্যাপক ড: মোজফ্ফর আহমদ চৌধুরী। তাঁর লেখা গভর্নমেন্ট এন্ড পলিটিকস ইন পাকিস্তান ও সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান আমাদের পাঠ্যবই ছিল। তখন থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টা ছিলেন ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন আয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের কড়া সমালোচনা করতেন। অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক এস এম আলী স্যার - নুর মোহাম্মদ মিয়া স্যার। রশীদুজ্জামান স্যার ও নারগীস আবেদ ম্যাডামের কথা মনে পড়ে। অর্থনীতি ও ফিলজফি ছিল

সাবসিডিয়ারী। ফিলজফির আমিনুল ইসলাম স্যার ও নীরু কুমার চাকমা স্যার এর কথা মনে আছে। আর একজন ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল হাই স্যার । মুসলিম ফিলজফি পড়াতেন - মুতাজিলা - আসারিয়া ইত্যাদি, আসকান চাপকান পরতেন ও পান খেয়ে মুখ লাল রাখতেন। আমিনুল ইসলাম স্যার ম্যাটাফিজিক্স পড়াতেন। নীরু কুমার চাকমা পড়াতেন সাইকোলোজি। ইকনমিক্স এর কথা একদম ভুলে গেছি- কোন স্যারের নামও মনে নাই।

বেইলী রোড থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন মাইল খানেক দুরত্বে। হেয়ার রোড হয়ে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর সামনে ঘুরে গিয়ে বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, চারুকলার পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী- পশ্চিম গেইট- এই পথে অথবা বেইলী রোডের মাথায় রমনা পার্কের গেট দিয়ে ঢুকে ঢাকা ক্লাবের পাশ দিয়ে রেসকোর্স মাঠের মাঝামাঝি পায়ে হেটে সোজা পার হয়ে যেতাম। সময় লাগতো আধা ঘণ্টা। মধুর ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে কলা ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার সিঁড়ির নিচে দিয়ে ঢুকতাম - একটু সামনেই নিচতলায় আমাদের ডিপার্টমেন্ট। নিয়মিত ক্লাস করতাম। কোন সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি বলে মনে হয় না। বিকালের দিকে ক্লাস কম থাকতো, দুপুরে খুব খিদা লাগতো কিন্তু আর্থিক অনটন সব সময় ক্ষুদা মেটানো সম্ভব হতো না। পকেটের অবস্থা ভালো থাকলে মাঝেমধ্যে মধুর ক্যান্টিনে এক পিস পাউরুটি বা একটি কলা, এক কাপ চা অথবা লাইব্রেরীর নিচে এক ব্যক্তি ডেকচিতে বিরিয়ানী বিক্রি করতো - কোয়ার্টার প্লেট -এ এক প্লেট আট আনা - দুই টুকরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাটন ও কয়েক চামচ ভাত ব্যবহার করে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতাম। কোন মাসে কিছু হাত খরচ বাঁচাতে পারলে টিএসসি লাইব্রেরী থেকে দু' একটা বই কিনতাম। এছাড়া বৃটিশ কাউন্সিল ও ইউসিস লাইব্রেরীতে যাতায়াত ছিল নিয়মিত, বড় বড় বিদেশী লেখকদের রেফারেন্স বই এখানে পাওয়া যেত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় লাইব্রেরী ছিল এক বিশাল গ্রন্থাগার- এখান থেকে ক্যাটালগ ধরে বই খুঁজে বের করা কষ্ট সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। পেটমোটা বেঁটে খাটো এক পিয়ন ছিল, সময়ের তাড়া থাকলে তাকে আট আনা দিলে সে তৎক্ষণাৎ দরকারী বইটি এনে দিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে না থাকলেও কোন হলের সাথে সংযুক্ত (এ্যাটাস্টেড) থাকতে হয়। রেকর্ড পত্র হলের মাধ্যমে মেইনটেইন করা হয়। আমি ঐতিহ্যবাহী – এসএম হল এ্যাটাসট্ ছিলাম - যাওয়ার পথেই ফুলার রোডে বৃটিশ কাউন্সিল ও ওপারে বুয়েট।

টিএসসিতে অনেক দামী রেস্টুরেন্ট ছিল। পয়সাওয়ালার ছেলেরা সেখানে খাওয়া দাওয়া করতো। আমার জন্য এসব ছিল শুধুই স্বপ্ন। টিএসসিতে প্রায়ই ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত ফাংশান চলতো। বাংলা বিভাগের রথীন্দ্রনাথ রায় প্রায়ই স্টেজ মাতাতেন; তার বিখ্যাত গান - আমার দেশ সব মানুষের তখন থেকেই শুরু। আমাদের ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ছেলেমেয়ে ও বেশ ভাল গাইতো। জ্যোস্না নামে চট্টগ্রামের এক মেয়ে ভাল নজরুল সঙ্গীত গাইতো। অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত।

ভাগ্নি জামাই এটিএম আহসান উল্লাহ জয়েন্ট সেক্রেটারী তখন সপরিবার আজিমপুর কলোনীতে থাকতেন; ভাগ্নি লিলি বয়সে আমার বড়; ছোট মামাকে খুব আদর করতো ও অনেক কিছু খেতে দিত। প্রায়ই ওখানে গিয়ে কিছু খেয়ে আসতাম।

মানিকদার ইতোমধ্যে প্রমোশন হয়ে উপ-বন সংরক্ষণ ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন সম্প্রসারণ বিভাগ হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। অফিস বেইলী রোডে বাসার সামনেই। মানিকদা প্রায়ই ফিল্ড ভিজিটে যেতেন শালনা, চন্দ্রা, গাজীপুর-এর দিকে। আমি ও সঙ্গে বেড়াতে যেতাম ডিএফওর গাড়ীতে- পরিতোষ বেঁটে খাট এক ড্রাইভার ছিল। মাঝেমধ্যে উইক এন্ডে দূরে কোথাও যাওয়া হতো; সঙ্গে আমার আর এক ভাই যিনি তেজগাঁও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে পড়তেন তিনিও থাকতেন। কোন সময় আবার ভাতিজা হাফিজ খুররম ও অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবরা অংশগ্রহণ করতো। একবার গাজীপুর গাছা নামক জায়গায় রেহেন মিয়ার খামার বাড়ীতে একরাত ছিলাম। পাখি শিকার করে বেশ ভাল খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। রেহেন মিয়া দূর সম্পর্কের আত্মীয়, পুরান ঢাকায় বাড়ীও স্টেডিয়াম মার্কেট এ ফ্লেভার কনফেকশনারীর মালিক। বেড়াতে যাওয়ার সময় তিনি অনেক মুখরোচক খাবার সঙ্গে নিতেন। তার মধ্যে ফ্লেভার এর হাঁসের রোস্ট ও কিমা পরটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাতিজা হাফিজ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্সের ছাত্র। ওর মেজ ভাই খুররম পিআইএ-র পাইলট হওয়ার জন্য ফ্লাইং ক্লাবে প্রশিক্ষণরত, বড় ভাই খসরুও ঢাকায় ব্যবসা করতো। পরবতীতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়। আমাদের সব প্রোগ্রামে অবসর সাপেক্ষে এরাও অংশ নিত। গরমের দিনে আমরা বেইলী রোডের বাসার সামনে খোলা বারান্দায় অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মেরে ঘুমাতাম। আমাদের বাসা ছিল চার ইউনিটের লম্বা ব্যারাকের সর্ব দক্ষিণে; সর্ব উত্তরের ইউনিটে থাকতেন বনসংরক্ষক জনাব এনামুল হক। ওনার মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন; বড় মেয়ে নিপার সঙ্গে পরবর্তীতে হাফিজের বিয়ে হয়।

তার ছোট বোন দিপার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসার্ট আয়োজন করে ক্যানসার এর চিকিৎসা চালানো হয়েছিল।

কাওরান বাজার রেল ক্রসিং এর পাশে 'দ-রু-ল কাবাব' নামে এক বিখ্যাত ঝাল কাবাব এর দোকান ছিল। ভাতিজা খসরু প্রায়ই আমাদেরকে নিয়ে যেত তার গাড়ীতে; কাবাব খেয়ে অনেক রাতে ফিরতাম। টু-এম এনটারপ্রাইজ নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তার পার্টনারশীপ ছিল; এছাড়া সে খুব ভাল শিকারীও ছিল। হাসি ঠাট্টা ও কৌতুকে সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। মোটামুটি মানিকদার বাসাটা হয়ে উঠেছিল আমরা সব আত্মীয় স্বজনদের জন্য জম্পেস আড্ডা ও হাসি আনন্দের কেন্দ্রস্থল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ অনার্স ১৯৬৭-৬৮ ছিল শান্তিপূর্ণ, ১ম বর্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জিমনেসিয়াম হলে। বেখাপ্পা ও আনকমন প্রশ্ন হওয়ায় হলে চেঁচামেচি শুরু হয়। একজন অধ্যাপক সহানুভুতির সাথে খাতা দেখার আশ্বাস দিলে ছাত্ররা উত্তরপত্র লেখা শুরু করে। যথারীতি পাশ করে ২য় বর্ষে উত্তীর্ন হই।

২য় বর্ষ অনার্স ১৯৬৮-৬৯ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ সাহেবের নি:শর্ত মুক্তি ও অন্যান্য ইস্যুতে পাকিস্তান সরকার বিরোধী তুমুল গণ আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন মিছিল মিটিং, প্রতিবাদ সভা চলতে থাকে। সারা ঢাকা শহরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঢাকসুর নেতৃত্বে ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ ও অন্যান্য। গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্র আন্দোলন-এ ভাঙ্গন ধরাবার জন্য এনএসএফ নামক এক দালাল ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি করে। নেতৃত্বে ছিল খোকা, পাচপাত্তু প্রমুখ। এরা প্রকাশ্যে বিষাক্ত সাপ ও তলোয়ার প্রদর্শন করে ত্রাসের সৃষ্টি করতো। ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে মানুষ হত্যা করতো। তার পর জনতার হাতে এক সময় তাদেরও পতন হয়। আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা আরও কঠোর আন্দোলনের শপথ নিয়ে রাস্তায় নামে। আয়ুব শাহীর পতন শেখ মুজিবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। মোহাম্মদপুরে ছাত্র জনতার মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হয়। বিচার চলাকালীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহরুল হক-কে ক্যান্টনমেন্ট এর ভিতর গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান শেখ সাহেবকে নি:শর্ত মুক্তি দিতে ও ক্ষমতার মসনদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শেখ সাহেবকে রেসকোর্স মাঠে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয় ও ছাত্রনেতা তোফায়েল ভাই শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু'

উপাধিতে ভূষিত করেন। আর এক বিষফোঁড়া পাকিস্তান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহয়া খান এর হাতে পাকিস্তান সরকারের সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সরে পড়েন। যাওয়ার সময় দেশবাসীর জন্য ও ছাত্রদের জন্য মায়াকান্না করেন। রেডিওতে তার ভাষণ শুনেছিলাম। এই সময় আয়ুব খান উন্নয়নের দশ বছর পালন করছিল। আয়ুব খানের পতন ছিল বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ও ছাত্রদের এগার দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের বিজয়।

১৯৬৯-৭০ সাল। আমার অনার্স শেষ পর্ব পরীক্ষা প্রস্তুতি। ইয়াহয়া খান ক্ষমতায় আরোহন করে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার হুঙ্কার দিলেন তাঁর প্রথম কর্তব্য এই উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন দেওয়া। এল,এফ,ও জারি করা হলো- অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছামত নির্বাচন কতগুলি নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যাতে বাঙ্গালী কোনদিন পাকিস্তানের মসনদে বসতে না পারে। কিন্তু শত চেষ্টা করে ও নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ঠেকানো গেল না। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বাঙ্গালী পশ্চিমাদের উপর রাজত্ব করবে এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। শুরু হল নানা রকম টালবাহানা। লারকানার নবাব পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবী করে বসলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে মেজরিটি লাভ করেছেন। সুতরাং প্রধান মন্ত্রিত্ব তার দাবী। এক দেশে দুই মেজরিটি হাস্যকর। বার বার সংসদ অধিবেশন ডাকা ও স্থগিত করা হল, ভুট্টো আবার ও ঘোষনা করলেন সংসদ অধিবেশন ইসলামাবাদে হতে হবে অন্যথায় ঢাকায় গিয়ে তিনি "ডাবল জিম্মি" হতে পারবেন না। ইয়াহয়া খান ঢাকায় আসলেন, বেইলী রোডে আমাদের বাসার একেবারে সামনে প্রেসিডেন্ট হাউসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। পরপর ভুট্টো সাহেব আলোচনায় যোগ দিলেন। সামনে দিয়েই আমাকে হেটে যেতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ভয়ে ভয়ে যেতাম।

আসলে আলোচনাটা ছিল একটা প্রহসন; পূর্ব পাকিস্তানে তাৎক্ষনিক যুদ্ধ করার মত সেনা সদস্য, অস্ত্রসস্ত্র ও গোলা বারুদ মজুদ ছিল না। মজুদ গড়ে তোলার জন্য সময়ের প্রয়োজন। তাই আলোচনার নামে কালক্ষেপন। ইত্যবসরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দলে দলে সেনা সদস্য অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ আসতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ভুট্টোর ইচ্ছা ছিল পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাক যাতে তিনি অবশিষ্ট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সহজেই হতে পারেন, হয়েছিলেনও তা-ই। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুর ন্যায্য দাবীগুলোকে অগ্রাহ্য করে মনগড়া কাল্পনিক প্রস্তাব সমূহ উত্থাপন করা শুরু করেন।

এদিকে 'চার খলিফার নেতৃত্বে (নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্‌ছ মাখন) এগার দফা ভিত্তিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন জোরদার হতে থাকে।

২ মার্চ ১৯৭১, আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। কলা ভবনের সামনে বিশাল ছাত্র সভা। আ.স.ম আব্দুর রব মাথায় রুমাল বেঁধে সংগ্রামী নেতার আকৃতিতে হাত তুলে অনলবর্ষী বক্তৃতা করেছিলেন। আমরা সামনেই বসা ছিলাম। সমবেত জনতা সব রকম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত কিনা জানতে চাইলে সবাই হাত তুলে একাত্মতা ঘোষনা করেন। এই সভাতেই রব সাহেব জাতীয় সঙ্গীত ঘোষনা করেন ও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পরে অবশ্য পতাকার ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়।

এদিকে ইয়াহয়া ভুট্টোর সেনাবাহিনী ঢাকায় কিছু কিছু দমন পীড়ন চালাচ্ছিল। গুলিতে এক একজন মানুষ মারা যায়। লাশ নিয়ে মিছিল হয়। ছাত্র জনতা আরও উত্তেজিত হয়। ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধু মিটিং করে হুশিয়ারী দিলেন মানুষ মারা বন্ধ করার জন্য। কার কথা কে শুনে, পাকিস্তানীরা তখন এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল। দিনের পর দিন কারফিউ সত্বেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই তখন দেশ চলছিল জনগণ শুধু অপেক্ষায় ছিল কখন বঙ্গবন্ধুর মুখে স্বাধীনতার ডাক শুনবে। স্লোগান চলছিল- "ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।"

আসলো সেই আকাক্ষিত ৭ মার্চ। মানিকদা বদলী হয়ে রাঙামাটি চলে গেছেন। পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতে হচ্ছে আপার বাসায়। বাসাটা চারতলার উপর ঠিক গর্ভনর হাউসের সামনা সামনি, গুলিস্তান সিনেমার পাশে তৎকালীন জিন্নাহ এভিনিউ, পরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। বাসা থেকে গভর্নর হাউসে দিনরাত মিলিটারী কনভয় যাতায়াত দেখা যেত, রাস্তায় ও পল্টন ময়দানে সংগ্রামী জনতার স্রোত সবসময় চলমান থাকতো। সকাল থেকেই শুনা যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন ও তা সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে। দুলাভাই রেডিও খুলে বসেছিলেন কিন্তু পরে জেনেছিলাম ভাষন শুরু হওয়ার কিছুক্ষন আগে প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়; প্রতিবাদে রেডিও কর্মিরা অনুষ্ঠান বয়কট করে। আমি অনেক আগেই চলে গিয়েছিলাম এবং জায়গা পেয়েছিলাম মঞ্চের একেবারে পাশে। বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখার এবং ঐতিহাসিক ভাষণ শুনার সৌভাগ্য হয়েছিল। অতি অল্প সময়ে খুব সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধু ভাষণ শেষ করেন জনসমুদ্রের সেই অভুতপূর্ব উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধু ভাষণে সবাইকে যে কোন খারাপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সব রকম প্রস্তুতি নিতে বলেন। "সাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষনা করেন। মানুষ ও বুঝে যায় সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। দমন পীড়ন বাড়তে থাকে; সঙ্গে বাড়ে আন্দোলনের তীব্রতা।

১০ মার্চ আমার পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়; ইতোমধ্যে ছয় পেপার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বাকি সব অনিশ্চিত। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। মারাত্মক খারাপ পরিস্থিতি চারিদিকে, বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল মনে হল- তাই করলাম। পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা। ২৫ মার্চ ইয়াহয়া মুজিব বৈঠক ভেঙ্গে যায়। ইয়াহয়া, ভুট্টো রাতের আঁধারে চোরের মত ঢাকা ত্যাগ করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। ২৫ মার্চ সারারাত নিরস্ত্র মানুষের উপরে বর্বরোচিত আক্রমণ চালানো হয়। হাজার হাজার মানুষ শহীদ হয়। ৭ মার্চ এর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুযায়ী মানুষ প্রস্তুত ছিল; সে অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস আমি চুনতির বাড়িতে ছিলাম। প্রথমদিকে কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকলাম। কী করা যায় চিন্তা ভাবনা করছিলাম। এক রকম অবরুদ্ধ অবস্থা, কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। কিছু সমমনা তরুণদের সঙ্গে কথা বললাম। বাড়ীতে আব্বা থাকতেন একা, পাশে মেঝ ভাইয়ের এক তলা বাড়ী খালি পড়েছিল- অনেক রাত্রে ঐ বাড়িতে মিটিং করা শুরু করলাম। পাকিস্তানের দালালদের জেনে যাওয়ার ভয়ে খুব গোপনে দরজা জানালা বন্ধ করে আমরা কথা বলতাম। আমার একটা ন্যাশনাল ট্রানজিস্টার রেডিও ছিল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনে অনুপ্রাণিত হতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় পড়ুয়া আমার সহপাঠি কোন ছাত্র সেই সময় চুনতি-তে ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এরশাদুল হক ভেট্টু মাঝে মধ্যে মুন্সেফ বাজারে বসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা করতেন, আমাদের উৎসাহিত করতেন। আমাদের মিটিং এ নিয়মিত উপস্থিত থাকতো সিনিয়র হাবিব খান, আব্দুল মতলব (বাবুলের বাপ), তজুমিয়া দায়েম আলী, বেলাল ও হেলাল। সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা সত্বেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসছিল না। লুৎফর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, উনি মাঝে মধ্যে চুনতি আসতেন ও আমাদের সঙ্গে বসতেন। কী করা যায় চিন্তা ভাবনা করতেন। ওনার বেস সাহসী দুই চেলা ছিল- সাতগড়ের আব্দুছ ছালাম ও

হাজী রাস্তার আবুল হাশেম। এদেরকে প্রয়োজনে কাজে লাগাবে বললেন। আমার বড় ভাই কালুমিয়ার সঙ্গে এলাকার নির্বাচিত এমপি আবু সালেহ এর যোগাযোগ ছিল, তাঁর মাধ্যমে ওনার সঙ্গে খবর আদান প্রদান চলতো। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকের কয়েক মাস চুনতির অবস্থা শান্ত ছিল। মাঝামাঝি সময়ে শুরু হল হিন্দুদের উপর লুটপাট ও নির্যাতন। আমাদের বাড়ীর সোজা পশ্চিমে খুব কাছেই হিন্দু পাড়া, জমিদারী আমলে এরা সবাই আমাদের পূর্ব পুরুষদের জমিদারী সংক্রান্ত ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করতো। অনেকে অনেকটা আত্মীয়ের মত হয়ে উঠেছিল। রামকানাই কাকা, নিরঞ্জন, জগদীশ দাদা, সুরেশ, সুখেন্দু ইত্যাদি। লুৎফর ভাইয়ের নিয়োজিত আব্দুছ ছালাম মাঝে মাঝে সতর্ক করতো হিন্দু পাড়ায় ডাকাতি হতে পারে; আব্বার লাইসেন্সকৃত তিনটি বন্দুক ছিল, আব্বা ঘুমিয়ে গেলে চুরি করে বন্দুক বের করতাম। সারারাত হিন্দু পাড়া পাহারা দিতাম। তা সত্বেও হিন্দু পাড়া কয়েকবার লুট হয়ে যায়। আমাদের শক্তি কম থাকায় ডাকতদের মোকাবেলা করতে পারি নাই। বন্দুক যোগাড় হলেও জনসংখ্যা কম, গুলি বারুদ এর অভাব। এরপর হিন্দুদের টাকা পয়সা, সোনাদানা ও ধান আমরা জমা রাখি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বনজঙ্গল থেকে ফেরৎ আসলে তাদের সম্পদ যথাযথ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে কৃতজ্ঞতায় অশ্রু বিসর্জন করে। এখনও অনেকে স্মরণ করে। পশ্চিমে আর একটি হিন্দু পাড়া আছে। দাস্যা ঘোনা নামক পাহাড়ের ভিতর তাদের জমিজমা ও গরু ছাগল ছিল। সেখান থেকেও গরু ছাগল লুট করা হয়। আমরা যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি।

বাড়ি থেকে দক্ষিণে ৩ মাইল, জাঙ্গাইল্লা পাহাড়, রাস্তা ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক সরু। উভয় পাশে উঁচু পাহাড় ও গভীর জঙ্গল। আমরা একটা পরিকল্পনা নিলাম রাস্তার উভয় পাশে উঁচুতে জঙ্গলের ভিতর। দুই গ্রুপ হয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বন্দুক ও গুলি নিয়ে বসে থাকবো। মিলিটারী কনভয় কক্সবাজারের পথে ঐ সরু পথ পার হওয়ার সময় উভয় দিক থেকে গুলি করে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাবো। এ পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। চুনতিতে অনেক শিকারী ছিল, প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে বন্দুক ও গুলি ছিল। এসব অস্ত্র ও গুলি দিয়ে সহযোগীতা করলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিলিটারীর ভয়ে কেউ সহযোগীতার হাত বাড়াতে সাহস করে নাই।

আমাদের বাড়ি থেকে সোজা দুই মাইল পূর্বে পুটিবিলা ইউনিয়নের জোড় পুকুরিয়া এলাকা। এখানে পাশাপাশি দুইটি পুকুর লাগানো- সেই হিসাবেই এই এলাকার নামকরণ। পুকুরের পূর্বে উঁচু পাহাড় জঙ্গলাবৃত। তার পরে ভারতের সীমা পর্যন্ত বিস্তির্ণ বনাঞ্চল। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এই টিলার উপর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপিত হয়। কোথা থেকে তারা এসেছে কেউ জানতো না। সম্ভবত

বর্ডারের দিক থেকেই। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় উত্তর বঙ্গের লোক। কমান্ডার ছিল বরিশালের । ক্যাম্পে যোগাযোগ করাও ছিল কষ্ট সাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ তবুও আমরা ক্যাম্পের বাইরের কিছু লোকের সাহায্যে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের এলাকা থেকে চাঁদা করে চাল ডাল তরি তরকারী ও কয়েকটি ছাগল ক্যাম্পে পাঠাই। বেশীর ভাগ হিন্দুরাই চাঁদা দিত। এই ক্যাম্প থেকে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করে কিছু মিলিটারীদের দোসরদের গ্রেফতার করা হয় ও ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার ঠিক পরের দিন ক্যাম্প কমান্ডার চুনতি আসেন। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি ও আনন্দে লাফাতে থাকি। তিনি আমাকে কয়েকটি নির্দেশনা দেন। সেই অনুযায়ী কাজে লেগে যাই। পাড়ায় মিছিল করে আনন্দ উল্লাস করি। মসজিদে তখনও 'হুকুমতে পাকিস্তানের জন্য দোয়া চলছিল। আমি সে জায়গায় 'হুকুমতে বাংলাদেশ' বানাই। আমি মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নেই নাই; আমাকে আমার পরবর্তীরা এ ব্যাপারে দোষারোপ করে। আমার জবাব যেহেতু আমি অস্ত্র হাতে সরাসরি যুদ্ধ করতে সুযোগ পাই নাই সুতরাং আমি মুক্তিযোদ্ধা দাবী করা যুক্তিসংগত নয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একসময় ঘোষনা করেছিলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে যে-কোন রকম সহযোগীতা করেছে তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। আমি মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। সামান্য নাম্বারের ব্যবধানে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরী না হওয়ায় চাকরীতে যোগদান করি নাই। সার্টিফিকেট থাকলে গ্যাপটা কভার হয়ে যেত। যাহোক, আল্লাহর হুকুম, আমার জীবন মোটামুটি ভালই কেটে গেছে। আমার ছেলেমেয়ে নাতী-নাতনীতে ঘর ভরে গেছে ও আল্লাহর রহমতে সবাই ভাল আছে। আমার সঙ্গে কারও কোন শত্রুতা নেই, সবাই আমার বন্ধু। পারলে উপকার করি, কারও কোন ক্ষতি করি না। আমি সবার দোয়া পেয়েছি আরও দোয়া প্রার্থী।

পুনর্বার ভার্সিটিতে

বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু সংগ্রামের ফসল লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম আত্মত্যাগের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ৯২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য পাকিস্তানী জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং আরোর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসলে আবার লেখাপড়ার কথা চিন্তা করতে শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষা যতদূর হয়েছিল তার ভিত্তিতেই রেজাল্ট দেওয়া হয়। বিএ অনার্স ডিগ্রীধারী হয়ে গেলাম। মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে এক ব্যাচ বিসিএস

মুক্তিযোদ্ধার চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়। এরপর প্রথম সার্বিক বিসিএস লিখিত পরীক্ষা হয় যাতে আমি অংশগ্রহন করি। ফলাফল আগেই আলোচনা করেছি। ইতোমধ্যে ঢাকায় আমার ভাইবোন মারফত যে সমস্ত আশ্রয়স্থলে থেকে পূর্বের লেখাপড়া চালিয়েছি সে সমস্ত আশ্রয়স্থল বন্ধ হয়ে গেছে কারণ তারা সবাই ঢাকা থেকে অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন। আর্থিক অনটনের কারণে অন্য কোনভাবে ঢাকায় থেকে লেখাপড়া চালানো সম্ভব ছিল না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স শেষ পর্বে ভর্তি হলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার পূর্বের দুইজন শিক্ষক ড: আর আই চৌধুরী ও ড: নাজমুল আবেদীন স্যারকে এখানে পেয়ে গেলাম। তারা দুইজনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পরিবর্তন করে এসেছেন। আর আই চৌধুরী স্যার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন।

চট্টগ্রামে এসে উঠলাম আমার আর এক আপার বাসায়। ভাইবোন আমরা আল্লাহর রহমতে ১৪ জন। সুতরাং একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। দুলাভাই চাকরী করতেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রামের ষোলশহরে। সরকারী বাসা বেশ বড় সড় ছিল। এক কামরায় আমি লেখাপড়া করতাম। যাতায়াত ও সুবিধা ছিল। বাসার কাছ দিয়ে হাটহাজারী রাস্তার বাস চলাচল করতো। নাজির হাটগামী ট্রেনও পাওয়া যেত। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যারয় বাস সার্ভিসও ছিল। এলাকার পরিবেশ ছিল নিরিবিলি, ছিমছাম। বন-বনানী ঘেরা প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ দুলাভাই মাঝে মধ্যে অফিসের গাড়ী নিয়ে দূরে কাজে যেতেন আমিও তার সফর সঙ্গী হতাম।

মাস্টার্স ফাইনাল- এক বছর সময়। দেখতে দেখতে কেটে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তী সবকিছু অগোছালো, তবুও চারিদিকে খুশি খুশি ফুরফুরে পরিবেশ। মানুষের মুখে হাসি, মনোভাবটা এই যে, সাময়িক কষ্ট হলেও আমরা এখন বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের নাগরিক। বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র দালাল বিরোধী স্লোগান দেখা যাচ্ছিল। "দালাল নিধনযজ্ঞ শুরু কর"- "একটা একটা দালাল ধর, সকাল বিকাল নাস্তা কর"। যাহোক আস্তে আস্তে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। ছাত্ররা পড়াশুনায় মন দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই এক বছর শেষ হয়ে যায়। ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে রেজাল্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনে পা রাখলাম।

কর্মজীবন

১৯৭২ সালের পরীক্ষা ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। একটি সাময়িক সার্টিফিকেট নিয়ে কাজের সন্ধানে নামলাম। বেশীদিন বসে থাকতে হয় নাই। আমার ভাতিজা ড: সুলতান হাফিজ রহমান তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্বের ছাত্র। তার সাথে অনেক নামী দামী দেশী বিদেশী ব্যক্তিত্বের যোগাযোগ ছিল। তেমন-ই এক ব্যক্তি 'ডেরেক ব্রাউন' জাতে বৃটিশ তার বন্ধু, আমাকে কাজে লাগিয়ে দেয় একটি অস্থায়ী মৎস্য আহরণ প্রকল্পে কক্সবাজারে। ১৯৭৩ এর কোন এক সময়ে আমি কাজে যোগ দেই। স্বাধীনতা পরবর্তী রিলিফ এর কাজ করার জন্য সিসিডিবি নামক একটি খৃষ্টান সাহায্য সংস্থা বৃটিশ সাহায্য নিয়ে ঢাকায় কাজ শুরু করে। এই সংস্থার-ই একটি প্রকল্প ছিল 'মহেশখালী কো-অপারেটিভ ফিশারীজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। প্রকল্প পরিচালক ডেরেক ব্রাউন, অফিস কক্সবাজারে ও শাখা অফিস মহেশখালীর গোরকঘাটায়। আমার বেতন ধার্য করা হয় তৎকালীন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার বেতনের সমান তিনশ পঞ্চাশ টাকা। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়োগ দিয়ে জায়গা কিনে কক্সবাজারে অফিস বিল্ডিং তৈরী করার জন্য পাঠানো হয়। একজন পুরানা অভিজ্ঞ লোককে স্টোরম্যান করে পাঠানো হয়। বলাবাহুল্য তিনি সবদিকেই অভিজ্ঞ ছিলেন। নিজের ও অফিসের স্বার্থ দুটোই দেখতেন। তখনকার দিনে সরকারী খাস জমি সহজেই বন্দোবস্তী পাওয়া যেত। বর্তমান এয়ারপোর্ট হয়ে ভাঙ্গাচোরা রাস্তার শেষ মাথায় সমুদ্রের কিনারে এক খন্ড বিরান বালু ভূমি আমরা অফিস করার জন্য ঠিক করলাম।

কক্সবাজারের ডিসি অফিসে চেষ্টা তদবির করে অল্প সময়ে প্রকল্পের নামে অফিস করার জন্য যথেষ্ট জায়গা বন্দোবস্তী পেয়ে যাই। ধু ধু বালুচরের উপর কিছু দিনের মধ্যে একটি একতলা অফিস ভবন ও একটি বড় হল ঘর তৈরী হয়ে যায়। সেখানেই আমরা অফিস করা আরম্ভ করি। হল ঘরটি ব্যবহার হয় জাল, ইঞ্জিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখার স্টোর ও স্টোরম্যানের অফিস হিসাবে। ডিরেক্টরদের অস্থায়ী থাকার জন্য দুইটি তলাপাকা বেড়া ও টিনের কটেজ নির্মান করা হয়।

আমার কাজ ছিল ফিল্ড এক্সটেনশান অর্থাৎ মাঠ পর্যায় কাজ সম্প্রসারণ করা। আমাকে সহকর্মী দেওয়া হয় চারজন, বাবলু, মাসুদ, বারী ও বিদ্যুত। প্রত্যেককে আবার দুইজন করে সহকারী দেওয়া হয়। কাজ ছিল প্রত্যেকদিন মহেশখালী যাওয়া- সেখানে একশজন গরীব দু:স্থ জেলে নির্বাচন করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণ শেষে দশ জন করে এক একটি গ্রুপ তৈরী করা এক এক

মাঝির নেতৃত্বে। এক গ্রুপকে একটি নৌকা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জালসহ সরবরাহ করা হবে। উদ্দেশ্য ছিল নগদ টাকায় রিলিফ না দিয়ে মৎস্য আহরনের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়ে দশটা গরীব জেলে গ্রুপকে বিনা খরচে পুনর্বাসন করা। এই কাজ শেষ হলে প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্যাপক ঘুরাঘুরি করতে হয়েছে সারা মহেশখালী জুড়ে। সকালে কক্সবাজার ঘাট থেকে ইঞ্জিন বোটে রওয়ানা হতাম। মহেশখালীতে তখন কোন জেটি ছিল না। ভাটার সময় হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাদার মধ্যে নামতে হতো। উপরে উঠে ভাঙ্গাচোরা চাঁদের গাড়ীতে গোরকঘাটা থেকে ঘটিভাঙ্গা পর্যন্ত যেতে হতো। রাত হয়ে গেলে অত্যন্ত নিম্নমানের হোটেলে প্রচুর মশার কামড়ের মধ্যে রাত কাটাতে হতো। প্রশিক্ষণ চলতো রাত্রে। তাই ঐ সময় মহেশখালীতে রাতে থাকতে হতো। পরে অস্থায়ীভাবে একটি ঘর ভাড়া করে নিয়েছিলাম।

মহেশখালীর মানুষ খুব অতিথিবৎসল, অনেকেই মৎস্যজীবি। বাজারের আশেপাশে বাড়ী হওয়া সত্বেও তারা বেশীর ভাগ সময় বাজারে দোকানে কাটায়। যেদিন মাছ ধরা থেকে ফিরবে ও পকেটে টাকা থাকবে,

সেদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে চা-দোকানে ও হোটেলে চা-পান সিগারেট ভাত সমান তালে চালাতে থাকবে। আর একটু ভাল আয় হলে কক্সবাজারে গিয়ে মার্কেটিং, সিনেমা দেখা ও ভাল ভাল খাওয়া।

এই সময় মহেশখালীর চেয়ারম্যান ছিলেন গোরকঘাটার সম্ভ্রান্ত বংশের জনাব আনছারুল করিম। তিনি মাঝে মাঝে আমার অফিসে আসতেন ও জেলেদের জন্য সুপারিশ করতেন। এই সময় তিনি ছিলেন করাচি ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তবু হয়তো সাধ হয়েছিল এলাকার সাধারণ জনগণের সেবা করা। পরে অবশ্য তিনি এসব ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করেন বলে জানা যায়। আমার ভাতিজা ডঃ নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে ও নাকি তিনি কাজ করেছিলেন বলে তার কাছেই শুনেছিলাম।

কক্সবাজারে প্রথমে আমরা একটি পাকাঘর ভাড়া করে সাত জন মেস্ করে থাকতাম। কিছুদিন অফিস ক্যাম্পাসেই রাত কাটাতাম। কবির নামে লোহাগাড়ার একটা ছেলে আমাদের পিয়ন কাম বাবুর্চি রান্না করতো। একটু বাতাস হলে বালিতে সব খাওয়ার অযোগ্য করে দিত। বাধ্য হয়ে বাসা ভাড়া করে মেস জীবন শুরু করি। মেস থেকে অফিস পর্যন্ত অফিসের গাড়ী লিফট দিত। গাড়ীগুলি ছিল অতি পুরানো কয়েকটি উইলিস জীপ ও ল্যান্ডরোভার। ল্যান্ডরোভার ছিল দুইটা একটা চালাতো ড্যারেক ব্রাডন নিজে আর একটা চালাতো ও রেইলী নামক আর

এক ইংরেজ; এই ব্যাটা ছিল এক নম্বর হারামি। তার কাজটা কী আমরা বুঝতাম না। বউ নিয়ে আসতো, রেস্ট হাউজে কিছুদিন থাকতো, প্রচুর মদ সঙ্গে নিয়ে আসতো- সেগুলি শেষ হলে ঢাকায় ফেরত যেত। এই কয়দিন আমাদের উপর খামাখা মতব্বরী দেখাতো। যারা স্যার স্যার করে পিছনে ঘুরত তাদেরকে সে পছন্দ করতো। আমি একবার ও তাকে স্যার ডাকি নাই; তাই আমাকে মোটেই পছন্দ করত না। একবার সমুদ্রের চরে ল্যান্ডরোভার চালানোর সময় বালিতে সম্পূর্ণ দেবে যায়। কোন রকমে বউসহ সে পালিয়ে আসে। গাড়ীটি অনেক কষ্টে তুলে আনলেও লবণাক্ত হওয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। চাকরীতে ঢুকার সময় ভাতিজা সুলতান হাফিজ বলেছিল এদেরকে বেশি বেশি স্যার স্যার না করার জন্য। তাতে তারা মাথায় উঠবে। আমি পরামর্শ মনে রেখেছিলাম। তবুও কাজের লোক বলে ডেরেক ব্রাডন আমাকে পছন্দ করতো, আমি তাকে ডেরেক' বলেই ডাকতাম। যা মাথায় আসতো তাই করে ফেলতো। গাড়ী চালাতো খুব জোরে। ঢাকা থেকে মদ বোঝাই ল্যান্ড রোভার নিজে চালিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে আমি পাশে থাকতাম। গর্তে পড়ে গাড়ী লাফিয়ে উঠলে মদের বোতল ভেঙ্গে যেত। তবুও গাড়ীর স্পীড কমতো না। কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিয়ে হয়, বিয়ের সময় ডেরেক ব্রাডন আমাকে উপহার হিসাবে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে ফেরত কয়েকটি বিশাল আকারের ট্রাক আমাদের অফিসে আনা হয়েছিল। ড্রাইভারও রাখা হয়েছিল। আসলে এগুলি ডিরেক্টরের আর এক পাগলামী। এসব ট্রাকের এখানে কোন কাজও ছিল না। বাবলু নামে এক সহকর্মী ঐ ট্রাক চালিয়ে মাঝে মাঝে বাসা থেকে অফিস যেত বিকট রকমের আওয়াজ করে। আমি একবার একটা নিয়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে ফার্নিচার আনতে গিয়েছিলাম। পথে পথে কয়েকবার খারাপ হয়। মটর সাইকেল আমদানী করা হয়েছিল জাপান থেকে সুজুকি-১২৫- অদ্ভুদ ধরনের। এর আগে এ ধরনের মোটর সাইকেল এদেশে দেখা যায় নাই। মোটামুটি পাগলা ডিরেক্টর এর সবকিছু পাগলা কান্ডকারখানা। আর একবার আমাকে বললো এক ধরনের নুতন প্রযুক্তির জাহাজ তৈরীর কারখানা খোলা হয়েছে চট্টগ্রামে পাথরঘাটার ফিশারীঘাটে। আমাকে ঐ কাজ শিখার জন্য সেখানে প্রশিক্ষণে যেতে হবে। কাজ শিখে আসলে আমার প্রকল্পতে প্রকল্প প্রধান করে আমাকে আরেকটি প্রকল্প 'জাহাজ নির্মান প্রকল্প শুরু করতে হবে। কাজটি চ্যালেঞ্জিং মনে করে আমি রাজি হলাম। পাথর ঘাটায় ফেরো সিমেন্ট বোর্ড বিল্ডিং ইয়ার্ড" এ প্রশিক্ষণ-এ যোগ দিলাম। প্রকল্পটি ক্যানাডিয়ান হাংগার ফাউন্ডেশান পরিচালিত, প্রকল্প পরিচালক ড: গর্ডন বিগ । এছাড়া একজন অষ্ট্রেলিয়ান ফোরম্যান ছিল নাম নিয়ল। গর্ডন বিগ খুব কড়া মেজাজের লোক

ছিল। সকাল ৭টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত অফিস, দুপুরে মাত্র ১ ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক। এর মধ্যে কড়ায় গন্ডায় কাজ আদায় করে নেবে। একটু এদিক ওদিক হলেই বকাঝকা করতো। কনকনে শীতের মধ্যেও ঠিক ৭টায় রুমঘাটা থেকে পাথর ঘাটা বেশ দূরত্বে পৌঁছে কাজ শুরু করতে হতো। অন্যান্য প্রকল্প থেকে যারা প্রশিক্ষণার্থী এসেছে সবাই মিস্ত্রি ধরনের। আমার জন্য লোহা ওয়েল্ডিং করে সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে নৌকা বানানো মোটেই যোগ্য কাজ ছিল না। ৭ মাস অমানুষিক পরিশ্রম করলাম, একদিন ডেরেক ব্রাউন আমার কাজ দেখতে গেলে আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমার দ্বারা এসব কাজ করিয়ে কোন ফায়দা হবে না। কী ভেবে ডিরেক্টর আমাকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে মূল প্রকল্পে ফেরত পাঠালেন। ঐ সময় ও রেইলী সাহেব কিছুদিনের জন্য দায়িত্বে ছিলেন- তিনি আমাকে ফেরৎ না নিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ডিরেক্টর আমার পক্ষে থাকায় তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমি আবার পূর্বের কাজে যোগ দেই। এই সময় আমার বিয়ে হয়; বউ নিয়ে কয়েকদিন হোটেল নিরিবিলির পাশে একটি কাঠের ঘরে ছিলাম। পরে সার্কিট হাউস রোডে একটা কাঁচা পাকা দুই রুমের একটা ঘর ১৫০ টাকায় ভাড়া করি- পিছনে আলাদা আলাদা পাকঘর, পায়খানও টিউবওয়েল ছিল। আমার এক রুমেই হয়ে যেত। তাই আর এক রুমে পেইয়িং গেস্ট হিসাবে রেখেছিলাম অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট হেনরী পঙ্কজ কে, এতে খরচের দিকে কিছু সাশ্রয় হতো।

বিয়ের পর এই বাসায় চাকুরীকালীন মোটামুটি ভালই ছিলাম। কাছেই সমুদ্র, অবসরে সমুদ্র স্নানে যেতাম। সামনেই বনবিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসা যারা আবার আমার বড় ভাইয়ের কলিগ। সেই সুবাদে ওনাদের বাসায় যাতায়াত ছিল। স্থানীয় অন্যান্য অফিসার পুলিশ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ও সম্পর্ক ছিল। বুলবুল আপা ও মতিন দুলাভাই একটু দূর সম্পর্কীয় হলেও কাছে থাকায় অত্যন্ত আপন হয়ে যায়। রান্না হলেই আদান প্রদান হতো। এই বাসায়-ই আমার প্রথম সন্তান নিশুর জন্ম হয়। আমার কোন নিকট আত্মীয় স্বজন এই বিপদের সময় উপস্থিত ছিল না, ভাল ডাক্তারেরও অভাব ছিল। স্থানীয় এক মহিলা আমাকে ভাই ডাকত। আমি আপা ডাকতাম 'ফাতেমার মা আমাকে আগাগোড়া থেকে সহযোগীতা করেন। তার হাতেই নিশুর জন্ম হয়, এর আগে ডাক্তার ভুল করে ব্যাথা নাশক ওষুধ দিলে প্রসবে অনেক দেরী হয়। এই 'ফাতেমার আম্মার বাসায় আমাদের কলিগ বারী পেয়েইং গেস্ট থাকতো ও তাকে আপা ডাকতো। ভিতরে ভিতরে বারী সাহেব ফাতেমার সঙ্গে প্রেম করে বসে ও শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেচারী ফাতেমার মা সহজ সরল মহিলা বলেন- "আমি তাকে ভাই ডাকি, সে আমাকে

আপা ডাকে, তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া কখনও সম্ভব নয়"। এই অজুহাতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় নি।

ব্যাচেলর থাকতে মেসে থাকতে খুব অসুবিধায় ছিলাম। আমি একজন-ই মদ খাই না বাকি সবাই মদখোর। রাত হলেই মদ খেয়ে ভীষণ মাতলামি শুরু করে। একজনকে আরেকজন ধরে কান্নাকাটি করে আবার আমার পায়ে ধরে ক্ষমাও চায়, পেশাব করে ঘর ভরিয়ে দেয়। বিয়ের পর বৌ নিয়ে ঘর ভাড়া করায় এসব অত্যাচার থেকে রক্ষা পাই।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই চাকরিতে ছিলাম। এরই মধ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বি উত্থান। বউ বাচ্চার অন্নসংস্থান দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠে। আমার বেতন তখন ৭০০ টাকা। নিয়মের চেয়ে বেশি কিন্তু দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট নয়। স্থানীয় পৌরসভার সদস্যকে অনুরোধ করে একটি রেশন কার্ড যোগাড় করি; তাতে কোনরকম জানে রক্ষা পাই।

প্রথম ব্যবসা

মহেশখালীতে যে সব লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের মাছ ধরার পাশাপাশি লবণ ও শুটকির ব্যবসা ছিল। চিন্তা করলাম তাদের মধ্য থেকে কিছু বিশ্বস্ত লোক বাছাই করে তাদের ব্যবসায় শেয়ার করব-যাতে কিছু লভ্যাংশ পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে লবণের ব্যবসা শুরু করলাম- এতে আমার চাকরির কোন ক্ষতি হয় নাই। জেবর মুল্লুক নামে আমাদের প্রকল্পের দলভুক্ত মহেশখালীর ঘটি ভাঙ্গার এক জেলেকে ১০ হাজার টাকা দিলাম এই শর্তে যে সে লবন কিনে গুদামজাত করবে ও সময়মত বিক্রি করে লভ্যাংশের অর্ধেক আমাকে দিবে। এই টাকা আমার নয়; আমি খুব আর্থিক সংকটে ছিলাম, এর মধ্যে এত টাকা জমা বা উদ্বৃত্ব থাকার প্রশ্নই উঠে না। টাকাটা নিয়েছিলাম আমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে। তাতেও শর্ত ছিল লাভ হলে কিছু অংশ তাদেরকে দিতে হবে। অফিসের কাজে প্রায়-ই ঘটিভাঙ্গা যেতে হতো। তাতে নিজের ব্যবসাও দেখাশুনার সুযোগ হতো। জেবর মুলুকের বাড়ীতে প্রায়-ই রাত থাকতাম। খুব ছোট এবং নিচু একটি মাটির গুদাম ঘর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে ছাদ মাথায় লাগে। তার আছে দুই বউ, তাদের স্থান সংকুলান করাই মুশকিল। সামনের দরজাটা বেড়ার - সেটা এক পাশে সরিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকতেই একটি চৌকির পাশেই মাটিতে একটি পাটি বিছিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা - ভিতর দিক থেকে বউরা ভাত তরকারী ঠেলে দেয় সামনে আসে না। পেশাব পায়খানার কোন ব্যবস্থা নাই। প্রয়োজনে একটা বদনা

দেওয়া হয় ও বলা হয় যে সামনে সমুদ্রের চরের দিকে যাওয়া যাবে। যখন যেমন তখন তেমন মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। একরাতে আমি ঐ চৌকিতে ঘুম; হঠাৎ গুলির আওয়াজ- হৈ চৈ, ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে দেখলাম কতগুলো জাল নিয়ে কিছু লোক টানাটানি করছে। শেষ পর্যন্ত জালগুলি ফেলে দিয়ে ডাকাতদের পলায়ন, কারন গৃহকর্তাও ডাকতের চেয়ে কম নয়। এখানকার জীবন এরকমই। এক জেলে সমুদ্রে আর এক জেলের জাল চুরি করে। এতে কোন আফসোস নাই। কিছুদিনের মধ্যে ঐ জেলে আর এক জেলের জাল সুযোগ মত চুরি করে তার ক্ষতিপূরণ করে। এটাই নাকি সমুদ্রের নিয়ম।

আমার ব্যবসা কয়েক বছর চলেছিল। খুব একটা সুবিধা হয় নাই। তবে লোকটা ভাল ছিল বলে সামান্য কিছু লাভসহ আমার মূলধন ফেরৎ পেয়েছিলাম।

এর পরে চেষ্টা করলাম শুটকির ব্যবসা। আমাদের অফিসের সামনেই জেলেরা সমুদ্রের চরে ছোট ছোট বেড়ার ঘর তৈরী করে শুটকি শুকায় শুকনা মৌসুমে। হাঙ্গরের পালক শুকিয়ে রপ্তানী করা হয়। ভাল লাভ আসে। অন্যান্য শুকটি পাইকাররা ঐ বাসা থেকেই ভাল দামে কিনে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের দলভুক্ত দুই জন জেলে ব্যবসা করতো - আছাদ আলী ও আবু সৈয়দ, দুই জনই মহেশখালীর পুটিবিলা এলাকার বাসিন্দা। তাদের সঙ্গে একই রকম শর্তে টাকা খাটালাম। মাঝে মাঝে মহেশখালীতে তাদের বাড়ীতে যেতাম অথবা কক্সবাজারের শুটকির বাসায় প্রতিদিনই প্রায় দেখা হতো। শেষ পর্যন্ত একই অবস্থা, তাদের নাকি তেমন লাভ হয় না; আমার চাকরি শেষ হওয়ার পরেও অনেকদিন বাড়ী থেকে ঐ বাসায় যাতায়াত করেছি। গেলে আমার যাতায়াত খরচের টাকা ও কিছু ভাল জাতের শুটকি উপহার দিয়ে আমাকে বিদায় করা হতো, আস্ত একটা মাছ ভাজি করে ভাত দিত। অবস্থা এরকমই, খুব একটা সুবিধা হয় নাই।

চাকরি ক্ষেত্রে আমার যা দায়িত্ব ছিল তা ঠিকমত পালন করেছি। মহেশখালীর গরীব জেলেদের মধ্যে প্রকৃত হকদার খুঁজে বের করে দশজন করে দশটি গ্রুপ করে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ঐ দশজনের মধ্য থেকে আবার রেকর্ড ভাল ও অভিজ্ঞ একজন মাঝি বাছাই করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের সঙ্গে পাকা চুক্তিনামা সম্পাদন করা হয় ও প্রতি ১০জনকে একটি করে জালসহ ইঞ্জিন নৌকা সরবরাহ করা হয়। তাদেরকে কো-অপারেটিভ মৎস্য সমিতির সদস্য করা হয়। মাসিক, বাৎসরিক চাঁদা ধার্য করা হয় যাতে প্রয়োজনে তারা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মেরামত ইত্যাদি কাজ চালাতে পারে। এই পর্যন্তই প্রকল্পটির কাজ। তিন বছরের মধ্যে এই কাজের সফল সমাপ্তি হয়। আস্তে আস্তে প্রকল্প গুটানোর কাজ শুরু হয়। কাজের মনিটরিং ও জমা খরচের অডিট নিয়মিত চলতো। ঢাকা থেকে

বড় কর্মকর্তারা প্রায়ই আসতো তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিদেশ থেকে খৃস্টানদের বড় বড় ধর্মীয় নেতা। তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে খেদমতে নিয়োজিত থাকতাম। তাদের কাছে অফিসের কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হতো। একবার সরকারী নির্দেশে পুরান টাকা জমা দিতে বলা হয়। আমার কাছে ৭০০ টাকা সদ্য বেতন তোলা জমা ছিল। হিসাব রক্ষক হেনরিকে বললাম কী করা যায়? সে অফিসের টাকার সঙ্গে আমার টাকাও জমা দিতে বলায় তা-ই করলাম। আমাকে আরও আশ্বস্ত করা হল ২/১ দিনের মধ্যে নূতন টাকা তুলে আমারটা ফেরৎ দেওয়া হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরের দিনই ঢাকা থেকে অডিট টিম আসে। তাদেরকে অনুরোধ করা সত্বেও অফিসের হিসাবে জমা দেওয়া সব টাকা-ই অফিসের, এই অজুহাতে আমার টাকা ফেরত দিতে অস্বিকৃতি জানায়। বিরাট একটা শক খেলাম। হিসাব রক্ষক হেনরি তার অপরাগতার জন্য শুধুমাত্র দু:খ প্রকাশ করে কর্তব্যে ইতি টানে।

শিকার করা তো বাপ দাদার সূত্রে পাওয়া নেশা। আমার বন্দুক ছিল, মাঝে মাঝে শিকারে যেতাম। রামুর দিকে বড় বড় জলাভূমি ছিল। সেখানে নানা জাতের পাখি বসতো - প্রায়ই সেখানে পাখি মারতে যেতাম। একবার আমার অফিসের সামনেই বড় হাঁসের এক ঝাক এসে বসে। খবর পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়ে বন্দুক নিয়ে আসি। ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে হাসের দিকে এগিয়ে যাই। বন্দুকের আওতার মধ্যে গিয়ে দেখি হাঁসগুলি বেশ বড়, রাজহাঁসের মত। বন্দুকে প্রথমে চার নম্বর ছরা ভরেছিলাম- চিন্তা করলাম হবে না। বদলিয়ে এলজি ঢুকালাম। নৌকা কাছাকাছি ভীড়তেই হাঁস উড়াল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে অবস্থায় তিনটাকে এক লাইন করে গুলি করলাম। ভুতের মত তাকিয়ে দেখলাম সবটাই উড়ে চলে গেল। খেয়াল করলাম একটার পা ভাঙ্গা আর একটা ভাল করে উড়তে পারছে না। কিছুদূর ওড়ার পর আর একটা ছোট দ্বীপমত চরে পুরা ঝাকটাই আবার বসে যায়। আর এক গুলি করার জন্য ছুটলাম। কিন্তু তা আর হলো না। আমি রেঞ্জে পৌঁছার আগেই হাঁস আবার উড়াল দেয়। শুধু একটি হাঁস আর উড়তে না পারায় বসে থাকে। নৌকা ভিড়িয়ে সেটা ধরে নিলাম। দেখলাম বড় গুলি হওয়ায় এফোড় ওফোড় হয়ে গুলি বের হয়ে যাওয়ায় একটু সময় লেগেছে। বাকি আর একটি আহতকে আর পাওয়া যায় নাই। অফিসের সামনে আসতেই ভীড় জমে যায়। আমার এক আত্মীয় জনাব মোস্তাক আহমদ চৌধুরী ইলিশিয়ার জমিদার ও কক্সবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সম্ভবত শিকারের উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়েছিলেন আমাকে হাঁস নিয়ে আসতে দেখে আমার পিঠ চাপড়ে নাম ধরে বাপের যোগ্য সন্তান বলে মন্তব্য করলেন। হাঁসটায় আনুমানিক ৫ কেজি

মাংস হয়েছিল। রান্না করে আমরা বাসার সবাই খাওয়ার পরও আব্বার জন্য সামান্য পাঠাতে পেরেছিলাম।

মাঝে মাঝে টেকনাফে হিলার দিকে চলে যেতাম, সেখানে বড় বড় বিলে হাঁসের ঝাক বসতো। হাঁস ভীষন চালাক পাখি। অনেক দূর থেকে মানুষের আভাস পেলেই উড়ে চলে যেত। সে জন্য খুব কষ্ট করে সাবধানে এগুতে হতো কঠিন মাটির উপর দিয়ে মহিষ ঝাকের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে হাস এর কাছাকাছি গিয়ে গুলি করতাম। এক গুলিতে ৩/৪ টা থেকে ৪/৫ টা পর্যন্ত মেরে ছিলাম। একবার আমার বড় ভাইদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম ও রাত্রে টেকনাফ বনবিভাগের রেস্ট হাউজে রাত কাটিয়েছিলাম ভাতিজা কামরুল হুদাও সঙ্গে ছিল। আমাদের শিকারের গল্প শুনে কক্সবাজার থানার ২য় কর্মকর্তা সামাদ - তাকে একবার নিয়ে যাবার বায়না ধরে। তিনি নিজে শিকার করেন না তবুও দেখার জন্য যেতে চান। বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে আবার যেতে হলো। স্থানীয় এক ছেলে আমাদের সঙ্গে যায় ও আমাদেরকে রাত্রে তার বাড়ীতে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে; বাড়ীর অবস্থা ভাল, খাওয়া থাকা দুই-ই হলো। পরদিন সকালে শিকার করে বাসায় ফিরলাম। সারাদিন হাঁস রান্না হলো, অনেক রাতে দারোগাসহ খাওয়া দাওয়া চললো, অনেক রাতে গল্প সল্প করে দারোগা চলে গেলন ঠিক সেই রাতেই আমার বাসায় চুরি হয়। জানালার পাশেই কাপড়ের আলনা ছিল। শীতকাল - দামী শাল ও জামা কাপড়গুলি জানালা খুলে বাইর থেকে নিয়ে যায়। সামাদ দারোগাকে বললাম- তিনি হেসে মন্তব্য করলেন যে, ওনার উপস্থিতিতে চুরি হওয়া তো অত্যন্ত অপমানজনক ব্যাপার সুতরাং চোর অবশ্যই ধরতে হবে। প্রচেষ্টা চলছিল কিন্তু চোরের টিকিটিরও খবর পাওয়া যায় নাই। আর একবার রামুর কাছাকাছি খুব সকালে এক সহকারীকে নিয়ে মুরগী শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে বাঘের ডাক শুনলাম। অচেনা জায়গা- পথ ঘাটও জানা নাই তাই বিপদের আশঙ্কায় আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে আসি।

দেখতে দেখতে তিন বছর সময় শেষ হয়ে আসছিল। কানাঘুষা চলছিল আমাদের সকলের চাকরি যাবে। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ। একদিন শুনলাম বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান কক্সবাজার বেড়াতে আসছেন। সবার মুখে হাসি বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখার জন্য। এ ঘটনা তার মর্মান্তিক মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগের। এয়ারপোর্টে অপেক্ষায় ছিলাম। বঙ্গবন্ধু নামলেন ও হাতনেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন; বিশাল হৃদয়ের মহানুভব এক ব্যক্তিত্ব বললেন "আমি জনগণের সঙ্গে হেঁটে রেস্ট হাউজের দিকে যাব" বলেই গাড়ীতে না উঠে হাঁটা শুরু করলেন। এর পূর্বে তাকে দেখেছিলাম ৭

মার্চ স্টেজের উপর। এবার একেবারে পাশাপাশি হাঁটলাম - কুশল বিনিময় হলো। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ও চোখ ভরে যায়। কখন ফিরে গেলেন ঠিক মনে নাই, কিছুদিনের মধ্যে মর্মান্তিক খবরটা পেলাম। শুনে খুব খারাপ লাগলো। মনে হলো অত্যন্ত আপনজনকে হারালাম। তারপর ঘনঘন পট পরিবর্তন। আজকে বাদশাহ কালকে ফকির। বিশ্বাসঘাতক খোন্দকার মোশতাক এর বিদায়, জিয়াউর রহমান এর আগমন কর্ণেল তাহের এর অভ্যুদয়, জিয়াউর রহমান এর মুক্তি, কর্নেল হায়দার ও খালেদ মোশাররফের বন্দী ও হত্যা ইত্যাদি।

অফিসে ছোট কর্মচারীদেরকে ছাটাই করা শুরু হয়েছে। প্রত্যেককে নোটিশ এর পরিবর্তে এক মাসের বেতন দিয়ে তাৎক্ষনিক বিদায় করা হয়েছে। আমি আরও কিছুদিন টিকলাম। ছোটদের পরে বড়দেরকে ধরা শুরু হলে আমিও একদিন নোটিশ পেলাম। একমাসের বেতন নিয়ে বিদায় হলাম। খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠান বলেই কথা- কোন রকম যোগ্যতা না থাকা সত্বেও একজনও খৃস্টান কর্মচারী কর্মকর্তার চাকরি যায় নাই। তাদেরকে সিসিডিবি (খৃস্টান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ) এর অন্যান্য প্রকল্পে পুন:নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক শেষ অনুরোধটা রাখলেন- তার গাড়ী দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

শরৎ এর- এক সুন্দর সকালে বউ বাচ্চা নিয়ে শেষ আশ্রয় পৈত্রিক বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। আব্বা সামনে বসা ছিলেন। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। আব্বার অভাবের সংসার, তার উপর আমি সপরিবারে বোঝা এসে উঠলাম। নিজে খরচ করে চলার মত ও আমার কোন সঙ্গতি নেই। চিন্তায় পড়লাম কী করা যায়। কোন রকম রোজগারের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। পত্রিকায় বিজ্ঞপন খুঁজে বিভিন্ন দিকে চাকরির জন্য দরখাস্ত করা শুরু করলাম। ঢাকায় একটি এনজিও সংস্থা থেকে ইন্টারভিউ কার্ড আসলো, ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হয়ে গেল কিন্তু বেতন মাত্র ৫০০ টাকা। আমি সর্বশেষ চাকরি করেছি ১৪০০ টাকা বেতনে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। ৫০০ টাকা বেতনে ঢাকা শহরে চাকরি করে খরচ যোগানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আব্বার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি একমত তাই চাকরিতে যোগ দেওয়া হলো না।

প্রথম জমির মালিক

এক রাখাল বন্ধু পরামর্শ দিল যদি সমান্য টাকা পয়সা থাকে তাহলে আপনি কিছু জমি কিনুন, এতে বাৎসরিক বাড়ীতে কিছু ধান আসবে যাতে কোন রকম খেয়ে পরে বাঁচতে পারবেন। বন্ধুর নাম তজুমিয়া। কাছেই বাড়ি। জমির কিছু সংবাদও জানালো সে। মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ি এলাকায় দাস্যাঘোনা নামক জায়গায় কিছু জমি বিক্রি হবে। দাম কানি প্রতি (৪০ ডেসিমেল) ৪,০০০ টাকা, বেশ সস্তা। আব্বাকে না বলেই দুই কানি জমি কিনার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছু টাকা চাকরির কামাই থেকে অবশিষ্ট ছিল, আর কিছু ধার কর্জ করে জমিটা বেগম সাহেবার নামে কিনলাম। কারণ, তিনি আমার কাছে মোহরানা বাবদ টাকা পাওনা ছিলেন। পরে আস্তে আস্তে পাশাপাশি আরও জমি বিক্রি হয় ও আমি তা কিনে ফেলি সেখানে আমার মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কানি বা দুই একর। এখান থেকে বেশ ভাল পরিমাণ ফসল আসতো। বছরের একাংশ এই ফসল থেকে ব্যয় নির্বাহ হতো। জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র তখন কিছুই বুঝতাম না। আস্তে আস্তে এসব শিখতে আরম্ভ করলাম। মালিকানা ঠিক রাখার জন্য এসব জানতে হয়। জমি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে নামজারী খতিয়ান সৃজন ও নিজ নামে খাজনা দাখিলাকর্তন পর্যন্ত হয়ে গেলে মালিকানা মজবুত হয়। এই সময় আবার ভুমি জরিপ শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে আমার কেনা জমি আগের মালিকের নামে জরিপ হয়ে যায়। এই কাজ যারা টাকার বিনিময়ে কাজ করে দেয় তাদেরকে 'টন্নি' বলা হয়। আমিও 'টন্নির মাধ্যমে চেষ্টা তদবীর করে ৩১ ধারা মামলা করে ভুল সংশোধন করলাম। জরীপ কাজ শেষে খরিদকৃত জমির নুতন মালিকের নামে খতিয়ান বের হয়। এই সময় জায়গা জমি ও কাগজপত্র সংক্রান্ত নামগুলি মুখে মুখে শিখে নিলাম।

আবার ব্যবসায়িক চিন্তা

বসে থেকে তো আর সংসার চলে না তাই চিন্তা করলাম সুবিধামত চাকরী পাওয়া না গেলে কিছু ব্যবসা করা যায় কিনা। এলাকায় তখন গাছের ব্যবসা জমজমাট। অনেকে এই ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে একাকার। প্রথমে ছোট খাট করে শুরু করলে কোন নিজস্ব বিনিয়োগও লাগে না। লোহাগাড়া এলাকার কিছু

বড় ব্যবসায়ী দাদন দেয়। নিয়ম হলো কাঠ ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের খাতায় নাম লিখাতে হবে। ব্যবসা দুই রকম বৈধও অবৈধ। বৈধ ব্যবসায়ীরা বনবিভাগ থেকে বাৎসরিক নিলাম দেওয়া এক একটা এলাকার গাছ দাড়ানো অবস্থায় কিনে নিত, তারপর ঐ গাছগুলি কেটে বিভিন্ন রকম সাইজ করে বড় ব্যবসায়ীদের ঘাটিতে পৌছাতে হবে। নিলাম খরিদ বাবদ সরকারী টাকা প্রথমেই তারা অগ্রিম হিসাবে দিয়ে দেয় তারপর সারা বছরের যাবতীয় খরচও তারা বহন করে। এইভাবে বছরের পর বছর ব্যবসা চলতে থাকবে ও নির্ধারিত রেট অনুযায়ী হিসাবে কিতাবও দেনা পাওনা চলতে থাকবে।

অবৈধ ব্যবসায়ীদের কোন লাইসেন্স নাই। তারা পাহাড় থেকে বিভিন্ন কৌশলে কিছু গাছ ব্যবসায়ীদের ডিপোতে পৌঁছায়, এদেরকেও বিশ্বাসযোগ্যতার ও সামাজিক মান মর্যাদার ভিত্তিতে বড় ছোট আকারের দাদন দেওয়া হয়। একবার যার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় তার অধীনেই সারা জীবন ব্যবসা চালাতে হয় কারণ হিসাবের খাতায় অগ্রিম টাকর পরিমাণ কখনও শোধ হয় না পুরাপুরি তার উপর আবারো টাকা নিতে হয়। ব্যবসা ভাল করলে বিশ্বাস ভঙ্গ না করলে যত বড় অংক দরকার পাওয়া যায়। টাকার কোন অভাব নাই তবে ঐ ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা করার কোন সুযোগ নাই। বড় বড় করাত দিয়ে পাহাড়ে রাতভর বিভিন্ন রকম সাইজ করা কাঠ সবটাই দাদন পার্টিকে দিয়ে দিতে হবে। লাকড়ী জাতীয় ও অন্যান্য অকেজো গাছ অবশ্য বাইরে বিক্রি করা যাবে।

এ ধরনের বড় এক দাদন পার্টি লোহাগাড়ার মমতাজ মিয়া চৌধুরী কোম্পানীর খাতায় আমি নাম লিখালাম এবং ৭৭ সাল থেকে কাঠ ব্যবসা শুরু করলাম। চট্টগ্রাম শহরে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে কাঠের 'লট নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। নিলামে অংশ নিয়ে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে একটি কাঠের 'লট কিনি। সঙ্গে সঙ্গে ১ম কিস্তির টাকা আমার পার্টি পরিশোধ করে দেয়। বাকি দুই কিস্তি পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হয়। আমি এই লাইনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পাশাপাশি লট মালিকেরা সবাই অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম ও তাদের অনেকে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। সে অনুযায়ী আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। ১ম কাজ বড় বড় করাত ওয়ালা কয়েকটি করাত পার্টিকে এডভান্স বুকিং দিয়ে গাছগুলি চিড়াই করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া, বাকি গাছগুলি থেকে লাকড়ী সংগ্রহের জন্য অন্যান্য লেবারদেরও কাজে লাগাতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হয় তাই সব সময় কাজের তাড়া থাকে। গাছ কাটা শেষ হলে বন বিভাগের লোকজন গাছের উপর বিক্রয় মার্কা দেয়। তারপর সব গাছ ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট পাহাড়ী ট্রাক দিয়ে বের করে রাস্তার পাশে সুবিধাজনক জায়গায় 'ডিপো' করে জমা করা

হয়। সেখান থেকে পুনরায় চলাচল পাশ সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয়। বিক্রি না করলে বা মজুদ থেকে গেলে স্টক টিপি সংগ্রহ করে মজুদ রেখে দেওয়া যায় ও সারা বছর পুন: টিপি নিয়ে ব্যবসা করা যায়। এই কাজ অত্যন্ত দুরুহ ও শ্রমসাপেক্ষ। পাহাড়ের ভিতর প্রচন্ড গরমের মধ্যে প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যা কাজে লেগে থাকতে হয়। এছাড়া কর্মকর্তাদেরকে তোষামোদ করে প্রয়োজনীয় কাজ সময়ের মধ্যে আদায় করে নেওয়ার জন্য সেদিকেও অনেক সময় দিতে হয়। তারপর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিক্রির ব্যবস্থা করলে ব্যবসায়ীক লাইনে জড়িত অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে তাল মিলাতে হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করাও অনেক ঝামেলার কাজ, এজন্য অন্যান্য লট মালিকেরা কেরানী নিয়োগ দিত। আমি ঐ কেরানীদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে সব কাজ নিজেই করতাম। এভাবে পরবর্তীতে আমি একজন অভিজ্ঞ কেরানীতে পরিণত হই। কর্মকর্তাদের সাথে আমি সবসময় সদ্ভাব রেখে ব্যবসায়ীক নিয়মে যার যার পাওনা পরিশোধ করে কাজ করেছি। বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা পেয়েছি। কাজে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নাই। তবে দিন রাত হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়েছে। লাইসেন্সের বদৌলতে সারা বছর ব্যবসা করা যায়। অবৈধ কাঠ অন্যান্য এলাকা থেকে কম দামে কিনে নিয়ে বেশী দামে বিক্রি করা যায়। এ ব্যবসা ৮৫ সাল পর্যন্ত চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভ হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে লোকসানও দিয়েছি।একবার হারবাং এলাকায় গর্জন ও অন্যন্য গাছের একটি লট ২,৩২,০০০/= টাকায় কিনেছিলাম। বিশাল গর্জন গাছগুলির মাপ বন বিভাগ সরবরাহকৃত কাগজপত্রে দেখে ও দাম হিসাব করে নিলামে উচ্চমূল্যে দিয়েছিলাম। কিনার পরে সরে জমিনে দেখার পর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, বড় গাছগুলি সব 'তোর' অর্থাৎ বাইরের চামড়াটা শুধু অবশিষ্ট আছে। ভিতরে কোন কাঠ নাই বুঝে গেলাম অনেক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হব। কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারা বললেন ব্যবসা তো একবারের নয়, চালিয়ে যান- ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা থাকবে। অন্যথায় ডিফলটার হয়ে ব্যবসায়ীক বদনাম হবে। সুতরাং চালিয়ে গেলাম। ঐ বছর ২,৫০,০০০/= টাকা, তৎকালীন অনেক বড় অংক লোকসানে পড়েছিলাম। তবে পরবর্তীতে ব্যবসা চালু রাখায় আল্লাহর রহমতে লোকসান কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই।

এই ব্যবসায় কঠিন পরিশ্রম করেছি। সারাদিন খাটনির পর বাড়ী ফিরেছি। হয়তো কোন জরুরী ডাকে আবার চলে যেতে হয়েছে। ঠিকমত খাওয়া নাই- ঘুম নাই। বাড়ীতে সব সময় অভিযোগ না হলেও অনুযোগ অবশ্যই। ফল হয়েছে আশানুরুপ। এই ব্যবসায় থেকেই সংসার চালিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে ও কিছু জমি-জমা সম্পদ কিনেছি ও সংস্কার করেছি যা বর্তমান পর্যন্ত আমাকে সাপোর্ট

দিয়ে যাচ্ছে। আব্বার সঙ্গে যে বাড়ীতে থাকতাম তা দাদার নির্মিত অনেক পুরানা টিনের ছাওয়া মাটির গুদাম, জরাজীর্ণ ও বাস অনুপযোগী হয়ে যায়। কয়েক লাখ টাকা খরচ করে সেটাকে সংস্কারের মাধ্যমে বাসযোগ্য করি।

১৯৮৫ সালের দিকে নিলামে কাঠের 'লট বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তাই কাঠ ব্যবসায় ছেদ পড়ে। যারা দাদন দিত তাদের অনেক টাকা ব্যবসায়ীদের কাছে লগ্নি থেকে যায়। ব্যবসা না চালালে নগদ টাকা শোধ দেওয়া সম্ভব নয় এই অজুহাতে তারা অপারগতা প্রকাশ করে। আমি প্রয়োজন অতিরিক্ত দাদন গ্রহণ করি নাই। তাই আমার পক্ষে হিসাব বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বশেষ আমার পোষা দুইটি বড় বড় গরু দিয়ে শেষ ঋণটা শোধ করেছিলাম। কোম্পানীর মালিক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে ওনার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ঠিকমত লেনদেন শেষ করেছে।

আবার চাকরী

ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার চিন্তায় পড়লাম, কী করা যায় ভাবছিলাম। একদিন চুনতি মাদরাসার সুপার মৌলানা শফিক সাহেব আমার বাড়ীতে এসে আমাকে সাময়িক কিছু ইংরেজী ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমার ডিগ্রি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমি ইংরেজি ক্লাস কীভাবে করি এই প্রশ্ন রাখায় তিনি বললেন আপাতত চালিয়ে নিতে। পরে ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া গেলে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ালে চলবে। বেতনের টাকা সরকার থেকে না আসলে মাদরাসা থেকে ব্যবস্থা করা হবে। বসে থাকার চেয়ে বেগার খাটাও ভাল বলে আল্লাহর নাম নিয়ে মাস্টারী জীবন শুরু করলাম। এর আগে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কিছুদিন বিনা বেতনে চুনতি হাই স্কুলে ইংরেজি পড়াতাম। তাই মাদরাসায় সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই শুরু করেছিলাম। চালিয়ে নিয়েছি, তেমন অসুবিধা হয় নি। ইংরেজির পাশাপাশি নবম দশম থেকে ফাজিল শ্রেণী পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানও পড়াতাম। মাদরাসা থেকে ৭০০ টাকা বেতন দেওয়া হতো। পরে সরকার থেকে প্রভাষক পদে এমপিওভুক্ত হই। বছরখানেক পর কোন অজানা কারণে আমার প্রভাষক পদ কেটে দেওয়া হয় ও এমপিওতে সিনিয়র টিচার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আঘাতপ্রাপ্ত হলাম। অপমানিত বোধ করলাম। এভাবে তো চলা যাবে না। সুতরাং দেখা যাক আল্লাহ ভাগ্যে হয়তো আরও ভালো কিছু রেখেছেন। ধৈর্য্য ধরে আরও কিছু দিন চালিয়ে গেলাম যাতে ছাত্রদের লেখাপড়ার কোন ক্ষতি না হয়। আমার ছাত্রদের অনেকে এখন প্রতিষ্ঠিত আলেম, বড় বড় বক্তা, মাদরাসার মোহাদ্দেস, উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েরও কেউ কেউ উচ্চাসনে সমাসীন। এসব মনে হলে গর্বে বুক ফুলে উঠে ও মহান আল্লাহর শোকারিয়া

আদায় করি। শিক্ষক জীবনের এই তো চরম স্বার্থকতা। পরপর আরও কয়েকটি সুযোগ এসে যায় যাতে নিজেকে আরও বেশি করে কর্মোদ্যমী করে তুলতে বাধ্য হই।

চুনতি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা ও অধ্যাপনা

চুনতি একটি সবদিক থেকে সমৃদ্ধ গ্রাম। শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পুরানা আমল থেকে সুনাম অর্জন করেছে। এখানে রয়েছে বড় বড় জমিদার, উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তাদের ইতিহাস। অভাব শুধু একটি কলেজের। চুনতির নারীরা যেহেতু ধর্মীয় বিধি নিষেধের মধ্যে বেড়ে উঠে সুতরাং তাদের জন্য আলাদা একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভুত হয়।

আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথমে কথাটা ভাবেন চুনতির মৌলানা শফিক সাহেবের জামাই হাফেজ ডাক্তার মৌলানা শফিউর রহমান এমবিবিএস, ডেপুটি সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি। তিনি তার চাচা শশুর জনাব দীন মুহাম্মদ মানিকের সাথে কথাটা আলাপ করেন ও আস্তে আস্তে ব্যাপারটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। সর্বশেষ চুনতি ডাক বাংলোর বারান্দায় ছোটখাট একটি আলোচনা সভা বসে। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মঈনুল ইসলাম চৌধুরী হিরন, আহমদ সৈয়দ, ডা: শফিউর রহমান, মুশফিক হছোইন, মৌলানা ওবাইদুর রহমান, আমি এবং নাম মনে নেই এমন আরও অনেকে। মঈনুল ইসলাম চৌধুরীর প্রস্তাবে দীন মুহম্মদ মানিক এম.এ ইংরেজী-কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এর দায়িত্ব দিয়ে কাজ শুরুর কথা বলা হয়। সম্ভব হলে প্রধান রাস্তার পাশে ডাক বাংলোর সামনে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য এই এলাকায় জায়গা দিতে কেউ রাজী না হওয়ায় পরবর্তীতে চুনতি হাই স্কুলের দখলীকৃত স্কুলের পশ্চিমের পাহাড়ের উপর কলেজের জায়গা নির্দিষ্ট করে ভিত্তি দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আমি থাকায় অনুমোদন সহজে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ জনগণ পর্যন্ত স্বতস্ফূর্তভাবে এই কাজে অংশ নেয় ও সাধ্যানুসারে খরচ যোগান দেয়।

চুনতির মানুষ ভাল কাজে চাঁদা দিতে কার্পন্য করে না। তাছাড়া রয়েছে স্বনামধন্য পীর আউলিয়ার দোয়া ও প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগীতা। তাই প্রস্তাব সহজেই বাস্তবায়ন সম্ভব। ১৯৮৯-তে চুনতি মহিলা কলেজের যাত্রা

শুরু হয়। প্রথমে টিনের ছাওয়া একটি বেড়ার ঘর তৈরী করা হয়। এই ঘরেই পাঠদান অনুমতি মিলে যার কারণ তখন কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আখন্দ সাহেব যিনি আমাদের বড় ভাই জনাব আহমদ ফরিদ সিএসপি এর ভাবশিষ্য থাকায় নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষনাৎ পরিদর্শন ও অনুমোদন হয়ে যায়। পর পর আমার ভাই সফদর আহমদ খান জনাব মোর্শেদ খান এর কাছ থেকে ২০,০০০/= টাকা সাহায্য আনেন। এই টাকায় টিনশেড এক তলা পাকা ঘরের কাজ শুরু হয় বাকি কাজ ব্যাংক ম্যানেজার জনাব বদিউল আলম খান ধার হিসাবে টাকা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মানিক সাহেব অমানুষিক ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলেজের যাবতীয় সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান দিয়ে যান। তার এই পরিশ্রমের ফসল আজকের সু-প্রতিষ্ঠিত চুনতি মহিলা সরকারী কলেজ। তিনি আরও অনেকের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। যাদের নাম আমার জানা নাই। শুনেছি তৎকালীন মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও মহিলা এমপি জিনাত মোশারফ এর কাছ থেকেও তিনি চাঁদা এনেছিলেন। যা হোক মানিক ভাইয়ের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। তিনি এবং চুনতি মহিলা কলেজ একে অপরের পরিপূরক। এই সংগে সকল মহৎ ব্যক্তিবৃন্দকে আমি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাদের ত্যাগে আজকের সগর্বে মাথা উঁচু করা চুনতি মহিলা সরকারী কলেজ। ওনাদের ইতিহাস মানিক ভাইয়ের ডায়রীতে আরও বিস্তারিত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা থাকবে।

এক সময় মানিক ভাই আমার চাচী বেগম সুফিয়া কামালের সহায়তা চেয়েছিলেন, তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার কলেজের দিকে একটু সু-দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একান্ত স্নেহধন্য চুনতির সূর্যসন্তান মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন বাচ্চু ভাই এর কাঁধে কলেজ উন্নয়নেনের যাবতীয় দায়িত্বভার অর্পন করা এবং তিনি সুচারুরুপে সেই দায়িত্ব পালন করে কলেজকে সরকারী কলেজের চুড়ান্ত রূপ দান করেন। মহৎ প্রাণ ব্যক্তির মহৎ কার্যক্রম সমূহের সুন্দর ও সফল বর্ণনা দেওয়া আমার মত নালায়েক ব্যক্তির কলম থেকে এর বেশি কিছু বেরিয়ে আসছে না। সুতরাং শুধু বলবো "সেই সব নাম প্রাতস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয়"।

১৯৮৯ তে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তখন চুনতি মাদরাসার সিনিয়র টিচার হিসাবে এমপিওভুক্ত, এতে আমি অসন্তুষ্ট থাকায় কলেজ অধ্যক্ষ মানিক ভাইয়ের আহবানে বিনা বেতনে লেকচারার হিসাবে তার শিক্ষকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হই। ১৯৯২ পর্যন্ত মাদরাসার চাকরি চালিয়ে যাই। ৯৩ তে কলেজ এমপিও চালু হওয়ায় মাদরাসা থেকে চলে আসি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমি কলেজ থেকে কোন বেতন নেই; নাই এমপিও স্বাক্ষর করে বেতনের টাকা কলেজ উন্নয়নের জন্য তহবিলে রেখে আসতাম। ৯৭ এর পর থেকে বেতন

নেওয়া আরম্ভ করি এবং পুরাপুরি কলেজের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। পাশাপাশি চুনতি মহিলা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চুনতির মহিলারা সবাই মহিলা মাদরাসায় ভর্তি হয়। কলেজে আসে না। কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা নেহায়েত কম হওয়ায় অনুমোদন টিকিয়ে রাখা-ই দায়। তাই আমাদেরকে দূরদূরান্ত থেকে বিনা পয়সায় অধ্যয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধরে আনতে হয়। আমি মোটর সাইকেল চালিয়ে বড়হাতিয়ার দিকে প্রায়ই যেতাম কারণ ঐদিকে গরীব ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল। পিছনে অধ্যক্ষ সাহেব বসা থাকতেন। উনি মিষ্টি কথায় ছাত্রীও অভিভাবকদের রাজী করাতে চেষ্টা করতেন। কিছুদিন নুরু ভাইয়ের আর্থিক অনুদানে বিনা ভাড়ায় গাড়ীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক বাড়িতে আমরা ছাত্রীর খোঁজে গিয়েছি আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। তারা মনে করেছে আমরা ছেলের জন্য বউ দেখতে যাচ্ছি তাই কিছু খানার আয়োজনও করেছিল। আমরা পৌঁছার পরে স্বাদরে গ্রহণ করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করা হয় ছেলে কী করে? আমরা একেবারে অপ্রস্তুত! জবাব দেওয়ার ভাষা নাই। খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে কোন মতে পালিয়ে আসি। এভাবে ছাত্রী সংগ্রহ করে কলেজ টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অনেক বছর অব্যাহত ছিল।

১৯৯৩ সালে কলেজ এমপিওভুক্ত হয়। ৯৭ সাল পর্যন্ত আমার নামে আসা বেতনের টাকা আমি কলেজ তহবিলে দিয়েছি। এরপর থেকে আমি নিয়মিত বেতন নেওয়া শুরু করি। পর পর সহকারী অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি হয়। শেষ সময় বছর খানেক অধ্যক্ষের পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হই ও কাজ চালিয়ে যাই। সময় স্বল্পতার কারণে এই পদে নিয়মিতকরণ সম্ভব হয় নাই। ফলে উপাধ্যক্ষ হিসাবেই ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণ করি। ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুরোধে কলেজের প্রয়োজনে আমার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ৬০ (ষাট) শতক জমি কলেজকে দান করি।

পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা

কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে চুনতিতে পথিকৃৎ-ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পথিকৃৎ' এর শব্দগত অর্থ পথ-প্রদর্শক, উদ্দেশ্য ছিল পথ দেখান। আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া নয়। ১৯৮৯ তে এর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চুনতিতে শুরু করা হয়। সমাজ সেবা বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্ত এটি একটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নেন সংগঠন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ড: সুলতান হাফিজ রহমান, সিনিয়র রিচার্স ফেলো, বি আই ডি এস ঢাকা, তার একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় পথিকৃৎ বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প চালু হয় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্য সহায়তায়।

বনপুকুর এলাকায় অফিস করে লোহাগাড়া উপজেলা ব্যাপী কার্যক্রম শুরু করা হয়। ক্রমে চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও চকরিয়া উপজেলা পর্যন্ত পথিকৃৎ' বনায়ন প্রকল্প বিস্তার লাভ করে। ৪/৫ শ নারী পুরুষ কর্মী এই কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত জমিতে লভ্যাংশ ভাগাভাগির চুক্তির মাধ্যমে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করা হয়। প্রথমে এলাকার মানুষ জায়গা দিতে অস্বিকার করে কারণ তারা মনে করতো নানা ছল ছুতায় তাদের জমি বেহাত হয়ে যেতে পারে, ক্রমে অবস্থা দেখে মানুষ তাদের ধারণা বদলায়। পতিত ভূমি ও লালমাটি ব্যাপক সবুজ আকার ধারণ করে। বাড়ীর আনাচে কানাচে আর কোন খালি জায়গা অবশিষ্ট থাকেনা। প্রতিবছর বনায়ন মৌসুমে পথিকৃৎ কার্যালয়ে উৎসুক জমির মালিকদের সমাগম বাড়তে থাকে; কার্যক্রম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তহবিলের অভাবে এক সময় প্রকল্প সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হয়। বন বিভাগ ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শনে আসতেন ও প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক সর্ব জনাব কাজী জাকির হোসেন, খলিলুর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম, বি আই ডি এস, ও বিসিএস এর লোকজন কয়েকবার পরিদর্শনে এসে আমাদেরকে উৎসাহিত করেন। এ প্রকল্প কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। মার্ক' এর ড: মনোয়ার হোসেন পথিকৃৎ এর কার্যক্রম জরিপ করে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। ড: সুলতান হাফিজ নিয়মিত দেখাশুনা করতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন। প্রকল্প কার্যক্রম যাতে কোন ভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয়। শত শত একর বাগান সৃজন ও বহু নার্সারী সৃষ্টি হয়। পথিকৃৎ কর্মীরা প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীতে পরণিত হয়। পরবর্তীতে তারা ব্যক্তিগত নার্সারী ও বাগানের কাজে নিয়োগ লাভ করে। গরীব জনসাধারণ এর বাড়ীর আশে পাশে সৃষ্ট বাগান এর গাছ বিক্রি করে তারা বর্তমান পর্যন্ত ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ও বিয়ের খরচ যোগায়।

আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 'টিম স্পিরিটে' কাজ করেছি। ড: সুলতান হাফিজ সব সময় বলতেন- টাকা-পয়সার চেয়ে জনসেবাকে প্রাধান্য দিতে। তাই আমরা যৎসামান্য ভাতা গ্রহণ করেছি কোন কাজে বাইরে গেলে শুধুমাত্র আসল খরচটার বিল করেছি। আমাদের টিম মেম্বাররা ছিলেন সর্ব জনাব অধ্যক্ষ দীন মুহম্মদ মানিক, অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিক, অধ্যাপক আমান উল্লাহ, রাশেদ, নাছির, মোহাম্মদ আলী, নূরে মিল্লাত ও অন্যান্য। প্রকল্প পরিচালনার

সার্বিক দায়িত্ব ও আন্তরিক ব্যক্তিত্বগণের সমর্থন ও স্থানীয় গরীব নারীপুরুষের নির্ভেজাল সহায়তা ও দোয়া পেয়েছি।

ঢাকার একটি জাতীয় এনজিও 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস' সংক্ষেপে 'সিডিএস' এক সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি প্রকল্প চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা মূলত: মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করতেন। পথিকৃৎ এর অধীনে এই প্রকল্প চালু করতে আমি সম্মত হই। প্রথমে ঢাকায় গিয়ে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যোগাড় করি। তারপর চট্টগ্রাম অফিস থেকে এলাকা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। বলা বাহুল্য এসব সরকারী সহযোগীতা ও অনুমোদন সহজ লভ্য নয়, পিছনে লেগে থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে নাছোড় বান্দা মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রত্যাখ্যান, অপমান নিরবে সহ্য করতে হয়, তবেই সাফল্য আসে।

শেষ পর্যন্ত কার্যক্রম চালু করতে সক্ষম হই এবং ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সগৌরবে চুনতির প্রত্যন্ত এলাকা সমূহে সেবামূলক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি। পথিকৃৎ কার্যালয় সম্প্রসারণ করা হয়। ছোটখাট একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয় ও সাপ্তাহিক প্রত্যন্ত এলাকায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা করা হয়। ম্যানেজার হিসাব রক্ষক থেকে শুরু করে প্যারা মেডিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সমস্ত খরচ বহন, হিসাব নিকাশ, ডাক্তারদের নিয়মিত পরিদর্শন ইত্যাদি 'সিডিএস' দ্বারা পরিচালিত হতো। এলাকার গর্ভবতী নারীদের তালিকাভুক্ত করে প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় সেবা বিনা খরচে দেওয়া হতো। জটিল কোন কেস পাওয়া গেলে রেফার করা হতো। সগৌরবে এই কার্যক্রম ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। সিডিএস এর অর্থিক অনটনে প্রকল্প সংকোচন করতে হয়। ফলে এই প্রকল্প তারা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এদিকে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বৃক্ষরোপন প্রকল্প সমূহ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক স্থগীত ঘোষিত হওয়ায় বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। যাই হোক যা কাজ হয়েছে তাতে পথিকৃৎ এর অর্জন অনেক। দু:স্থ জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনই পথিকৃৎএর লক্ষ্য ছিল। তা অনেকাংশে বাস্তবায়ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলে বেশি বা কম লাভবান হয়েছে। এখনও মানুষ পথিকৃৎকে স্মরণ করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পথিকৃৎ কার্যালয় বর্তমানেও সচল আছে। হিসাব নিকাশ ও আপডেট করা আছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ও অন্যান্য সহযোগীরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় নুতন কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের তরুণদের প্রতি আহবান জানাই তারা চাইলে পথিকৃৎ কে আবার চাঙ্গা করতে পারবে।

পথিকৃৎ চুনতি মহিলা কলেজ ও চুনতি অভয়ারন্য

চুনতি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে কিছু দানশীল ব্যক্তি ও সাধারণ জনগনের সামান্য টাকায় কার্যক্রম শুরু করা হলেও অর্থের অভাবে ক্রমে কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে ডঃ সুলতান হাফিজকে অনুরোধ করলে তিনি পথিকৃৎ-কে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। কলেজ পাহাড়ে ও সংযোগ রাস্তা সমূহে বনায়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজ অধ্যক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও অফিস কর্মচারীদেরকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উঁচুনিচু মাটি সমান করার জন্য প্রচুর মাটি কাটার প্রয়োজন পড়ে। নির্দেশ অনুযায়ী 'বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর নিকট পথিকৃৎ এর মাধ্যমে কলেজ মাঠ উন্নয়নেন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব পাঠাই। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর প্রধান ডঃ আইভান নিজে পরিদর্শনে আসেন। খাওয়া দাওয়সহ যাবতীয় খরচ পথিকৃৎ বহন করে। ডঃ আইভান খুশী হন ও ঢাকায় ফিরেই অনুমোদনপত্র পাঠান। মাটি কাটার কাজ করেও আরও অনেক টাকা কলেজ তহবিলে জমা দেওয়া হয়। এতে এম পি ও প্রাপ্তির তদবির করা থেকে শুরু করে ও খুটিনাটি অনেক খরচ যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। ১৯৯৩ সালে কলেজ এমপিও ভুক্ত হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। পথিকৃৎ সৃজিত বাগান থেকে গাছ বিক্রি করেও কলেজের অনেক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়।

চুনতি অভয়ারন্যের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগীতা করাও পথিকৃৎ এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৮৬তে অভয়ারণ্য সরকারী গেজেটভুক্ত হয়। ১৯৯১ তে উদ্বোধন করা হয় বন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে । সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত ছিল পথিকৃৎ এর উপরে। পথিকৃৎ এর পোষা দুইটি হরিণ মন্ত্রী মহোদয় অবমুক্ত করেন। স্থানীয় জনমত স্বার্থ হানির আশঙ্কায় অভয়ারণ্য বিরোধী ছিল। উদ্বোধন এর দিন কিছু লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পথিকৃৎ এর মাধ্যমে জনগণকে বুঝিয়ে ক্রমে জনমত অনুকুলে আনা হয়। উৎসাহী বিদেশী দাতারা অভয়ারণ্য উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য ঘন ঘন পরিদর্শনে আসতে থাকে। তাদেরকে আমরা সব রকম সহযোগীতা করি। ছোট ছোট পথসভা করে জনগণের মনোভাব ইতিবাচক দেখাই। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব হয়। ২০০৫ সালে সরকারী বেসরকারী সহযোগীতায় চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। ইউএসএআইডির মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বনায়ণ এর ব্যবস্থা হয়। অনুমোদন এর মাধ্যমে ১ম কমিটি গঠিত হয়। ১ম সভাপতি হন আমার বড় ভাই এস.এ.

খান, দুর্ভাগ্য বশত: কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এতে সদস্যদের অনুরোধে আমাকে কমিটির হাল ধরতে হয়। ২ বছরের মধ্যে বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমি চার বৎসরের জন্য ১ম সভাপতি নির্বাচিত হই। চার বছর পূর্তিতে আমি পুনঃনির্বাচিত হই। একাক্রমে ১০ বছর আমি কমিটির সভাপতি থেকে অভয়ারণ্যের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে গেছি। আমার কমিটির সদস্যরা নিস্বার্থভাবে আমাকে কাজের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করেছিল বলে আমরা ২০১২ সালে ইউএনডিপি কর্তৃক জাতিসংঘ ইকুয়েটর পুরস্কার লাভ করি। এই পুরস্কার ছিল আমাদের কমিটির সাফল্যের স্বীকৃতি। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম সিএনএন অভয়ারণ্য পরিদর্শনে আসে। আমার স্বাক্ষাতকার নেয় ও প্রচার করে। এর পরপরই পুরস্কারের ঘোষনা আসে।

তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষক জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ অভয়ারন্য এর সার্বিক উন্নয়নেনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সব রকম সহায়তা দিতেন। পুরস্কার প্রাপ্তিতে ও তার প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি অবসরে যান। এতে কাজকর্মে সাময়িক ভাটা পড়ে।

বিধান অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে একই পরিষদ পর পর দুইবার এর বেশি নির্বাচিত হতে পারে না। সুতরাং তৃতীয়বার আমাকে সপরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়াতে হয়। বলা বাহুল্য এই কমিটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকে, ব্যক্তিগত আর্থিক বা অন্য কোন ধরনের স্বার্থ এখানে জড়িত নাই। উন্নয়নে প্রকল্পের টাকা বনবিভাগ কর্তৃক ছাড় করা হয় ও নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কমিটির কাজ নির্দেশনা দেওয়া, তত্বাবধান ও পর্যালোচনা, প্রয়োজনে কমিটি যে কোন ধরনের অব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থা নিতে বন বিভাগের নিকট সুপারিশ করতে পারে। বন বিষয়ক কাজে যাদের আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, কোন ধরণের ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া দেশের কাজ করার মন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই এই কমিটিতে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।

ভ্রমণ

১৯৮৯ তে প্রথমবার আমার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়। বড় ভাই ড: শফিক আহমদ খান মানিকদা অসুস্থ হয়ে ব্যাংকক এর সিরিরাজ হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সঙ্গে ভাবি একা। আমি ও বড়বোন বেনুকে ভাবীর সঙ্গ দেওয়ার জন্য ব্যাংকক যেতে বলা হয়। ঢাকায় গিয়ে ভাবীর দুলাভাই ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা আনোয়ার সাহেবের বাসায় উঠলাম। তিনি আমাদেরকে থাই

অ্যামবাসিতে নিয়ে গিয়ে ভিসার ব্যবস্থা করলেন। পাসপোর্ট আগেই করা ছিল। ২/১ দিন দুলাভাইয়ের বাসায় কাটালাম। আপা ও দুলাভাই অনেক আদর যত্ন করলেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সবাই মানিকদার জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। একদিনেই ভিসা হয়ে যায় ও পরের দিন সকাল ১০টায় ফ্লাইট। টিকেট দুলাভাই আগেই কিনে রেখেছিলেন। আমি প্লেন যাত্রাকে ভীষণ ভয় করতাম। এর আগে চট্টগ্রাম ঢাকা কক্সবাজার কয়েকবার আসা যাওয়া করেছি। অল্প সময়, ভয় লাগলেও কোনমতে সময় পার করেছি।

এবার বড় প্লেনে দীর্ঘ সময় যাত্রার কথা স্মরণ করে আগের রাতে সারাত ঘুমাতে পারি নি। শুধু ছটফট করেছি। খুব ভোরেই দুলাভাই আমাদেরকে নিজ গাড়ীতে করে এয়ারপোর্টে নিয়ে যান। প্লেন উঠা পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। যৎসামান্য খরচের টাকা সঙ্গে নিয়েছিলাম, দুলাভাই থাইল্যান্ডের ২০০ বাথ আমার পকেটে গুজে দেন ও গুডবাই জানান। প্লেনে উঠার পর থেকে যাত্রার দুঘন্টা সময় আমি শুধু আল্লাহ আল্লাহ করে কাঁদছিলাম। প্লেনে বসে একটি ফরম পুরন করতে হয়। আমি সেটা করতে না পারায় বেনু আপা সেটা পুরন করে দেন। দু'ঘন্টা পর প্লেন ব্যাংকক এয়ারপোর্টে অবতরণ করলে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ি। চুনতির একজন বড়ুয়া ছেলে নাম সামানন্দ বড়ুয়া থাইল্যান্ডে গিয়ে সে নাম পাল্টায় তাকে সেখানে সবাই মিস্টার চান বলে ডাকতো। হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর সে নিজেই গিয়ে মানিকদা ও ভাবির সঙ্গে পরিচিত হয়। তাকে পাঠানো হয় এয়ারপোর্টে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য। সে একটি বড় ফলকে 'জুনু মিয়া ও বেনু' লিখে উঁচু করে ধরে এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথের এক কোনায় দাড়িয়েছিল। অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। প্রথমে তাকে চিনতে পারি নি। লেখা দেখে তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রচন্ড গরম ছিল। প্রায় বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম। মি: চান অনেক কষ্টে একটি টেক্সি যোগাড় করে আমাদেরকে সিসিরাজ হসপিটাল পৌঁছায়। অনেক ক্ষণ গল্প সল্প করে বিদায় নেয়। তারপর থেকে সে প্রত্যেকদিন-ই আসত রুগীর খাবারের সঙ্গে প্রায় প্রতি বেলায়-ই শুকরের মাংস থাকতো, মাংসটা সেই খেতো। আমরা ভাইবোনকে মাঝে মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যেতো। অল্প খরচে বাসে করে অনেক জায়গা ঘুরে দেখা যেত। খরচ বাঁচানোর জন্য টেক্সি চড়া কম হত। একদিন মি: চান তার এক বান্ধবীর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। বান্ধবীর মন্তব্য হল, "চান নো গুড"। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলে। চান নাকি অনেকদিন থেকে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করছে না। হসপিটালে

সারাদিন আমরা চারজন থাকতাম রাত্রে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে আমি একা থাকতাম। খুব খারাপ লাগতো। মোটেই ঘুম আসতো না, প্রায়ই বিনিদ্র রজনী কাটাতে হতো। তারা পানিকে বলে 'না-ম' আমি একদিন এক বেয়ারার নাম জিজ্ঞেস করায় সে দৌড়ে গিয়ে এক বোতল পানি নিয়ে আসে। ইচ্ছা না থাকলেও তাকে ১৫ বাথ পরিশোধ করতে আমার খুব কষ্ট হয়। রাস্তাঘাট সব খাবারের দোকান খুব ভোর থেকে খুলে বসে থাকে। বেশির ভাগই নানারকম সামুদ্রিক মাছ। দুর্গন্ধে ভরা, মনে হয় যত দুর্গন্ধ তত তাদের পছন্দ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা অল্প পয়সায় খেয়ে নেয়। সন্ধার আগেই খাওয়া শেষ করে বাসায় ঘুমাতে যায়। পরের দিন আবার খুব সকালে কাজে যোগ দেয়। নানা রকম ফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'দুরিয়ান' নামক এক রকম আমাদের কাঠালের মত ফল তাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং দামী খাবার। পুরা ফলটা দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ লোকে কিনতে পারে না। তাই সকলের সুবিধার্তে এক একটি খোসা পলিথিনে প্যাকেট করে বিক্রি করে। আমি একদিন একটি খোসা কিনেছিলাম। বিশ্রি দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় খেতে পারি নাই।

সারা ব্যাংকক শহর অসংখ্য বুদ্ধ মন্দিরে ভরা। সকালে বের হলে অনেক বুদ্ধ ভিক্ষু খালি থালা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যাদের ইচ্ছা থালায় কিছু খাবার ফেলে যায়। তা দিয়েই তাদের দিনের অন্ন সংস্থান। রাস্তার মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর সাজানো লঞ্চ দিয়ে মানুষ পারাপার করা হয়। ছোট ছোট নদীর উপর দিয়ে ইচ্ছে করলেই নদীগুলোতে পুল তৈরি করা যায়। পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য এসব ব্যবস্থা। হসপিটালের অবস্থা খুব সাজানো গোছানো সুন্দর তবে তারা ভাল ইংরেজি বলতে পারে না বলে কথা বার্তার আদান প্রদান কষ্টকর। দোকানিরা ইংরেজি মোটেই জানে না। তাদের সঙ্গে ইশারায় কথাবার্তা চালাতে হয় ।

বড় ভাইয়ের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় একদিন মি: চানকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে যাই, চান নিজেকে একজন ভিক্ষু হিসাবে পরিচয় দেওয়ায় খুব সম্মান দেখিয়ে অতি অল্প সময়ে আমাদের কাজ করে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর বিমান অফিস গিয়ে ফেরৎ টিকেট কনফার্ম করি। নির্ধারিত দিনে রাত ১০ টায় প্লেন উড়াল দেয় ও ১২ টার পর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামে। ঢাকার দুলাভাইরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া সারতে রাত কাবার। মানিকদার ব্লাড ক্যান্সারের ভাল চিকিৎসা হওয়ায় তিনি আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যান। এক রাত্রে হঠাৎ তার অবস্থা খারাপ হয়, চট্টগ্রামের 'হলি ক্রিসেন্ট হসপিটালে তাকে

স্থানান্তর করা হয়। আমি ছাত্রজীবন থেকে অনেক সময় তার সঙ্গেই থেকেছি। দোষ-ত্রুটি ক্ষমা চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন "You are my golden brother". হসপিটালে মাস খানেক লড়াই করে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা আত্মীয় স্বজন বাদেও অনেক শুভকাঙ্খি তার পাশে থাকতেন। প্রয়োজনে রক্ত দিতেন। মা বাবার কবরের পাশে চুনতিতে তাকে দাফন করা হয়। চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। এত কম বয়সে আমাদের আর কোন ভাইয়ের মৃত্যু হয় নি। তাই মানিকদার জন্য আফসোসটা একটু বেশি।।

কোলকাতা ভ্রমণ

২০০৫ এ চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারন্যে সরকারী বেসরকারী সহযোগীতায় 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকাল শুরু হয়। ইউএসএআইডির অর্থায়নে 'কোডেক' নামক বেসরকারী সংস্থা 'নিসর্গ সাপোর্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। এই প্রকল্পের কার্যক্রম এর অংশ বিশেষ হিসাবে আমাদের কমিটির লোকজনকে ভারতে কর্মরত একই ধরনের কার্যক্রম পরিদর্শন এ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কোলকাতা ঘুরে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা থেকে যশোর ফ্লাইট ও সেখান থেকে বাসে কোলকাতা পৌঁছার কথা। অন্যান্যরা ঢাকায় হোটেলে আগের দিন অবস্থান নিয়েছিল। আমি ছিলাম মহাখালীতে আমার বোনের বাসায়। যথারীতি আমার প্লেন ভীতি দেখা দিল। রাত্রে মোটেই ঘুম হয় নাই। তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম 'প্লেন ক্রাশ'। সকাল সাতটায় ফ্লাইট তাই খুব ভোরে আমার দুই বন্ধু আমাকে নেওয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে হাজির। আমি তাদেরকে আমার স্বপ্নের কথা জানিয়ে যেতে অপারগতা জানালাম। তারা বললো, টিকেট ও ফেরত দেওয়া যাবে না। তাছাড়া কোলকাতায় সমস্ত প্রোগ্রাম মাটি। তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা তিনজন বাসে রওয়ানা হয়ে যাবো। রাত্রের মধ্যে কোলকাতা পৌঁছাবো তাতে পরের দিন কাজে যোগ দিতে অসুবিধা হবে না। সঙ্গে সঙ্গেই 'খালেক এন্টারপ্রাইজ বাসে গাবতলী থেকে বেনাপোল এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ বেনাপোল ইমিগ্রেশন চেক পোস্টে লাইনে দাঁড়িয়ে আমার কাগজপত্র চেক করে আমাকে আটকানো হয়। পাসপোর্টে লেখা ছিল আমার পেশা শিক্ষকতা। তাই আমি আমার কলেজ থেকে ছাড়পত্র না আনায় আমাকে ছাড়া যাবে না। পরে বন্ধুরা সুপারিশ করে কিছু বখশিশ এর বিনিময়ে ছাড় দেওয়া হয়। সেখান থেকে একটি টেক্সি নিয়ে কোলকাতা রওয়ানা হই। পথে অন্য একটি টেক্সি আমাদের টেক্সিকে ধাক্কা দিলে আমাদের তরুন যুবক ড্রাইভার খুব জোরে ঝগড়া বাধায় অনেক সময় নষ্ট হয়। কোলকাতা পৌঁছাতে ১২/১টা বেজে যায়। অনেক কষ্টে

তালতলায় একটি হোটেলে উঠে রাত কাটাই। পরদিন 'রফি আহমদ কিদওয়াই রোডে হোটেল আফরিনে উঠি। মুসলিম হোটেল পরিবেশ অনুকুল। পাশেই 'লাল মোহাম্মদ' এর খাবার দোকানে গরুর কাবাব পাওয়া যেত। পয়সা বাঁচাবার জন্য এক রুমেই একটা বড় চকিতে তিনজন থাকতাম। এভাবেই সপ্তা খানেক কাটালাম। কোলকাতা শহর ঘুরে এনজিওদের কার্যক্রম দেখলাম ও মত বিনিময় করলাম। দিল্লি, আগ্রা ঘুরে আসার ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয় নাই। অনেকে কেনাকাটা করে, আমি কিছু কিনি নাই। প্রচুর আঙ্গুর খেলাম ও বাড়ীর জন্য পাঠালাম। বাসে ঢাকায় এসে নিউ মার্কেট থেকে কিছু শাড়ী কাপড় কিনে 'ইন্ডিয়ান' বলে চালিয়ে দিলাম।

হজ্ব যাত্রা

ছেলেমেয়েদের মা সবসময় অনুযোগ করতো বয়স বেড়ে যাচ্ছে, হজ্ব করে নেওয়া অবশ্য উচিত। আমি বলতাম চাকরি থেকে অবসর হলে কিছু টাকা পাবো, তা দিয়ে ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত অন্য উপায় নাই। ২০০৩ সালে চাচাতো ভাই মৌলানা হাছান ছিদ্দিকী ও ভাবী আরেক কাজিন ভাই ডা: রেজা ও ভাবী দল বেঁধে আমাদেরকে সহ হজ্ব যাওয়ার প্রস্তাব করে। দুলাখ টাকা দরকার, আমর হাতে কোন টাকা নাই। গিন্নির নামে কিছু জমি ছিল। তাকে বললাম তার জমিটা বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করতে। টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমরা দুজনে হজ্ব ক্যাম্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য একটি এজেন্সিতে টাকা জমা দিলাম। আনুষ্ঠানিকতা প্রায় শেষ এমন সময় আমার প্লেন ভীতি দেখা দিল। প্রতি রাতেই খারাপ স্বপ্ন দেখতে দেখতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সঙ্গীরা আমাকে সান্তনা দিলেও আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত এজেন্সি মালিকদের শরনাপন্ন হলাম। তিনি বললেন টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় তবে নাম বদলে দেওয়া যেতে পারে। ঠিক করলাম বড় ছেলে আবরারকে মায়ের সঙ্গে পাঠাই। সে হিসাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ও মা-ছেলে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা সর্বমোটে খরচ করে আল্লাহর রহমতে ঠিকমত হজ্ব সম্পন্ন করে ফেরৎ আসে। যাওয়ার দিন এয়ারপোর্টে প্লেন উঠার দৃশ্য দেখে কেঁদেছিলাম। আসার দিন আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এবার সংকল্প করলাম প্লেনভীতি যা-ই থাকুক চাকরিতে অবসর হওয়ার পর যে-কোন উপায়ে হজে যাবো-ই ইনশা আল্লাহ। যদি সমুদ্র যাত্রা চালু হয় তাই করবো অন্যথায় বিধাতা যা করেন। সমুদ্র যাত্রার কথা শুনা যাচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার তা চালু করে নাই। ২০০৯ তে চাকরি থেকে অবসর নিলাম। প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমা টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা তুলে নিয়ে কেউ

না জানে মত রাউজানের 'থ্রি স্টার হজ্ব কাফেলা'তে টাকা জমা দিলাম, কারণ পরবর্তীতে কী হয় না হয় তা যেন কেউ না জানে। এই কাফেলার লোকজন কেউ আমার পরিচিত নয়। আমার এক বেয়াই হাছান সাহেবের মারফৎ টাকা জমা দিই। তিনি সব খবর গোপন রেখে আমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করেছেন। যথারীতি ভয় থাকলেও এবার মনকে শক্ত করলাম। যাওয়ার কয়েকদিন আগে খবরটা ফাঁস হয় সবাই আনন্দিত হয়। নিকট জনেরা চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে উপস্থিত থেকে আমাকে বিদায় জানায়। কাফেলার মালিক জাফর সাহেবকে সেদিনই প্রথম দেখলাম। কাগতিয়ার পীর সাহেবও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। সবাই ওনাকে নিয়ে ব্যস্ত, উনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী।

আমার সঙ্গে আমার মেয়ে পুলিশ অফিসার মিতু ছিল। সে আমাকে ওসি ইমিগ্রেশনের কামরায় নিয়ে (সপরিবারে) বসায়। ওসি সাহেব পদ মর্যাদায় আমার মেয়ের অধ:স্তন। তাই আমাদেরকে যথেষ্ট সমীহ করে আদর আপ্যায়ন করান। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সারার জন্য আমি উঠতে চাইলে তিনি বলেন যে আমাকে কোথাও যেতে হবে না। কাগজ পত্র নিয়ে তিনি সবকিছু কাজ করে দেন। প্লেনে উঠতে বলা হলে সবাই লাইনে দাঁড়ায়। আমি যেতে চাইলে ওসি সাহেব আমাকে বসতে বলেন। সবার উঠা হয়ে গেলে ওসি সাহেব আমাকে একজন লোক দিয়ে অন্য পথে মালামালসহ প্লেনে তুলে দিতে পাঠায়। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে এহরাম পরে লোকটার পিছনে হাঁটা দিলাম। সে কোনদিকে আমাকে নিয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না, কাফেলার কোন লোকজনের সঙ্গেও দেখা নাই। লোকটার নির্দেশ মত ব্যাগ কাঁধে নিয়ে প্লেনে উঠতে যাচ্ছি দরজায় দাঁড়ানো ক্রু বাধা দিয়ে বলে এদিকে কেন? সঙ্গী লোকটি জবাব দেয় 'ইনি ওসি ইমিগ্রেশনের বস'। ব্যাস, আর কোন কথা নাই, আমাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল উপরে ক্রু-দের বসার জন্য নির্দিষ্ট একটি ছোট কামরার মত জায়গায়। কামরাটা একেবারে খালি। একটু একটু ভয় লাগছিল। প্লেন তখনও ছাড়ে নাই। হঠাৎ আল্লাহর মেহেরবানী দেখি আমার এক ভাতিজা রবিন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এসে ঢুকছে। আমাকে দেখে আশ্চর্য। আমারও সেই অবস্থা। তাকে গল্প বললাম, আমার প্লেন ভীতির কথাও সে জানত। বলল ভয় পাবেন না সে সারাক্ষণ আমার পাশে বসা ছিল। পাইলট কয়েকবার খারাপ আবহওয়ার কথা জানালেও প্লেন ঠিকমত সকাল ৪ টার দিকে জেদ্দা এয়ারপোর্টে নামে। নামার সঙ্গে সঙ্গে রবিনের ফোনে চট্টগ্রামে আমার মেয়েকে আমি পৌঁছার সুসংবাদ দিই। তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। প্লেন থেকে নেমে ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়াই। ফজরের আজান হওয়ায় পাশেই নামাজের জায়গায়

নামাজ আদায় করি। ইমিগ্রেশন সারতে অনেক সময় লাগে তারপর লাইন ধরে বাইরে বেরিয়ে আসি। আমার কাঁধে বেশ ভারি একটা ব্যাগ ছিল, কষ্ট হচ্ছিল। এদিক ওদিক তাকালাম, কাফেলার কোন লোকের দেখা নাই। সবাই যেদিকে যাচ্ছে আমিও সেদিকে চললাম। মালামাল বোঝাই একটি ভ্যান আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, ইংরেজিতে লেখা আছে "আপনার মালামাল পরিবহনের জন্য আপনি ভাড়া পরিশোধ করেছেন। একজন আমাকে ইশারা করায় আমি ব্যাগটা ঐ ভ্যানে তুলে দিলাম। কোথায় নিয়ে গেল জানি না। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি তা-ও জানি না। পথিমধ্যে মোবাইল ফোনের দোকান দেখে সিম পাল্টালাম। অনেকক্ষণ পরে স্টেশনমত জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে নানা দেশের ক্যাম্প। ঘুরাঘুরি করে বাংলাদেশ ক্যাম্প দেখতে পেলাম। মালামাল এর স্তপ থেকে আমার ব্যাগটা খুঁজে নিলাম। প্রায় চারটা বাজছিল। ভীষণ খিদা ও টয়লেট খুঁজে নিলাম। পাশেই চা-এর দোকান কিন্তু দাম অনেক বেশি ও অনেক ভীড়। চায়ের জন্য লাইন ধরে অনেকক্ষন দাঁড়াতে হয়। চা- না খেয়ে কিছু ফল কিনে ক্যাম্পে চলে আসলাম। এতক্ষণে কাফেলার লোকদের দেখা। তারা পাসপোর্ট জমা নিয়ে হাতে পরিচয় কার্ড লাগিয়ে বাসে উঠায়। সন্ধ্যার দিকে মক্কা শরীফের কাছাকাছি চেক পোস্টে পৌঁছলে সরকারের পক্ষ থেকে খানার প্যাকেট দেওয়া হয়। খেয়ে পেট ভরে যায়। মক্কা শরীফ পৌঁছার পর মাগরিবের নামাজ শেষে কাফেলার পক্ষ থেকে ভাত দেওয়া হয়। আর খাওয়ার ইচ্ছা না থাকায় খাই নাই। কাফেলার নির্দেশে সবাই ওমরা করার জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়ে যাই। আল্লাহর ঘর দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি। ওমরা সেরে, চুল কেটে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিই।

ইব্রাহিম খলিল সড়কে কাবা শরীফের খুব কাছে একটি অতি সাধারণ হোটেলের তিন তলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। এক কামরায় বারজন পাশাপাশি। আরাম করার জন্য তো আসি নাই। তাই চিন্তা করে চুপ থাকি। খাওয়া দাওয়া ও তেমন সুবিধা নয়। পলিথিন ব্যাগে খাবার সরবরাহ করা হয়। খেতেই পারি না। ফলমূল খেয়ে চালিয়ে দিতাম। প্রবাসী বন্ধুরা এত ফলমূল আনতো যে খেয়ে শেষ করা যেত না। রুমমেটদের খেতে বললে তারা বলতো যে তাদেরগুলোও পঁচে যাচ্ছে। কাফেলার সবাই রাউজানের লোক হওয়ায় আমার নিজেকে একা মনে হতো। পরে অবশ্য অনেকে আমার বন্ধু হয়ে যায়। আজানের সঙ্গে সঙ্গে কাবা শরীফের জামাতে চলে যেতাম। পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। মাঝে মাঝে আয়েশা মসজিদ হয়ে ওমরা সেরে আসতাম। এক নাত জামাই 'দীনার ভাই এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে প্রায়ই ওমরা ও তোয়াফ করতে আমাকে

সাহায্য করতেন। নির্দিষ্ট দিনে আমাদেরকে বাসে করে মিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থানকালে একদিন বৃষ্টি হয়ে বিছানাপত্র ভিজে যায় কারণ মেঝেতেই সবার জন্য ঢালাও বিছানা ছিল। এখানে টয়লেট এর খুবই অসুবিধা, সংখ্যায় অনেক থাকলেও অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হয়। লাইনে 'পাকিস্তানিরা ঠেলাঠেলি ও খারাপ ব্যবহার করতে দেখা যায়। মিনা থেকে আরাফাত, আরাফাতে রাত কাটিয়ে পরের রাত 'মোজদালিফা' হয়ে মিনায় ফেরত আরাফাতে মাগরিবের নামাজ না পড়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গাড়ী আসতে অনেক দেরী হয়। আরাফাত থেকে মুজদালিফা সামান্য রাস্তা কিন্তু ভীড়ের জন্য গাড়ী চালানো যায় না। মুজদালিফা পৌঁছতে প্রায় রাত শেষ। আমার সঙ্গে কাগতিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস জনাব আনোয়ার ছিদ্দিকী ছিলেন। উনি তাড়াতাড়ি মাগরিব ও এশার নামাজ পড়ে নিতে বললেন। টয়লেট ও অজুর সমস্যা। পাশেই দেখলাম একটা বড় ট্রাক দাঁড়ানো। একটি পানির কলও কাছেই আছে। সেখানেই কাজ সেরে অজু করে নামাজ পড়লাম। একটু পরেই ফজরের আজান। দুজনে জামাত করে নামাজ পড়ে হাঁটা দিলাম। হাঁটা পথে 'মসজিদে মাশআরুল হারাম' দেখে মুহাদ্দিস সাহেব সহ নফল নামাজ পড়ে আবার মিনার দিকে চললাম। মুহাদ্দিস সাহেব মাঝে মাঝে ধৈর্য হারান। পথ বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি। আমি ওনাকে সোজা হাটতে থাকতে বলি ও ওনার বোঝা ভারি হওয়ায় আমি কিছু শেয়ার করি। উনি কৃতজ্ঞতা জানান। অচেনা পথে সোজা হেঁটে মিনা পৌঁছে যাই ও আবার একই সাথে শয়তানকে পাথর মারতে জামরাত-এ চলে যাই। আগের মত ঝামেলা নাই। কয়েক তলা হয়ে যাওয়ায় আমরা উপরে উঠে অনায়াসে কাছে গিয়ে পাথর মেরে মিনায় ফিরে আসি। এভাবে তিনদিন পাথর মারতে হয় ও কোরবানী করে মাথা মুন্ডন করে শেষ তোয়াফে জেয়ারত এর জন্য কাবা শরীফে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহর রহমতে সব কাজই ঠিক মত সমাধা করা সম্ভব হয়। ভাগনি জামাই শওকত কাবা শরীফের পাশেই পাহাড়ের উপর থাকতো। সে আমার সার্বিক দেখাশুনা করতো ও সবকাজে সহযোগীতা করতো। পরের শুক্রবার জুমা পড়ে বাসে মদিনা রওয়ানা হই, পথে নামাজের জন্য কয়েকবার যাত্রাবিরতি হয়। ফজরের নামাজের আগে মদিনা পৌঁছে হোটেলে উঠি। হোটেলটা বলতে গেলে বাঙালি পাড়ায়। আশেপাশে আরও অনেক বাঙ্গালী হোটেল। কিন্তু আমাদের হোটেল এর ম্যানেজার পাকিস্তানী ও তার আচার ব্যাবহার খারাপ ছিল। মনে মনে চিন্তা করতাম এত বাঙ্গালী হোটেল থাকতে আমাদের কাফেলা পাকিস্তানীকে বেছে নিল কেন? যাইহোক তাড়াতাড়ি রুমে উঠে গুছিয়ে নিয়ে আল্লাহর রসূল (স.) এর রওজা মোবারক জেয়ারত- এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। দূরত্ব বেশি নয়। পূর্বে উল্লেখিত মুহাদ্দিস আনোয়ার সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আল্লাহর নবী (স.) এর রওজা

মোবারক এর সামনে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষন এই অবস্থায় ছিলাম। কী বলেছি বা কী পড়েছি জানি না। মনের সমস্ত আবেগ আল্লাহ রব্বল আলামীন ও তাঁর পেয়ারা হাবিব (স.) এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে নববীতে প্রথম জামআত আদায় করার সুযোগ হয়। এর পর প্রথানুযায়ী ৪০ রাকাআত জামাতে নামাজ ঠিক মতই পড়তে পেরেছি আল্লাহর রহমতে। রাস্তা চিনে ফেলেছিলাম। হোটেল থেকে একাই অল্প দূরত্বে হেঁটে এসে প্রতিবেলা জামাতে শরীক হতাম। তাহাজ্জুদ-এ ও আজান দেওয়া হয়। তবে জামাত হয় না। মাগরিবের নামাজের আগে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করা হয়। কোন মুনাজাত করা হয় না।

আমাদের সময় শেষ। তাই কাফেলার নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর রসুল (স.) এর রওজা মোবারক শেষ বার জেয়ারত করে বিদায় নিলাম। দুপুরের দিকে মদিনা থেকে বাসে জেদ্দা বিমান বন্দর এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে শেষ রাত্রের দিকে পৌঁছাই। পূর্ববর্তী তিনদিন ঘন কুয়াশার কারণে অনেক ফ্লাইট উঠানামা হয় নাই। আমাদের নির্ধারিত দিনে কুয়াশা কমে যায়। সকাল ৭টায় ফ্লাইট ঠিকমত ছাড়ে ও বিকালের দিকে চট্টগ্রাম শাহ আমানাত বিমান বন্দরে অবতরণ করে। ওসি ইমিগ্রেশনসহ আমার পরিবারের অনেকে আমাকে স্বাগত জানায়। সন্ধ্যার পরে বাসায় এসে পৌঁছি। সবকিছু ঠিকঠাক মত হওয়ায় আল্লাহ রব্বল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি। একবার হজ্ব করে আসলে সবারই মনে হয় হয়তো কিছু অপূর্ণ থেকে গেছে। যদি আর একবার যেতে পারতাম! আমারও একান্ত ইচ্ছা হজ্ব না করলেও আরেকবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যদি ওমরায় যেতে পারি, আল্লাহ যেন সামর্থ দান করেন।

দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণ

ছেলেমেয়েদের কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছিলাম একসাথে সবাইকে নিয়ে ভারত ঘুরে আসার। ছেলেরা যা পারে নাই মেয়েরা পেরেছে। এক সপ্তাহ ভারত ভ্রমণের সব ব্যবস্থা মেয়েরা করে ফেলে। আমরা দুইজন, তিন মেয়ে ও তিন নাতনী মোট আটজন পাসপোর্ট, ভিসা সব সংগ্রহ করে নির্ধারিত দিনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ও ঢাকা থেকে কোলকাতা বিমানে যাত্রা করি। কোলকাতার দূরত্ব খুব কম হওয়ায় প্লেন উঠতে উঠতেই নামার সময় হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করে চা-নাস্তা দেওয়া হয়। খেতে খেতেই দমদম এয়ারপোর্টে নামি।

টেক্সি নিয়ে পুরানা শহরে মির্জা গালিব রোডে আমাদের বুকিং দেওয়া হোটেলে গিয়ে দেখি কোন রুম খালি নাই। অর্থাৎ বুকিংটা ঠিকমত হয় নাই। অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলে কোন রকম রাত কাটালাম। পরের সকালে বের হয়ে পড়লাম আজমীর এর রেল টিকেট সংগ্রহের জন্য। ফেয়ারলী প্লেস থেকে টিকেট দেওয়া হয়। সেখানে লাইন দিলাম। টিকেট পেতে প্রায় দিন শেষ তা-ও পাওয়া গেল 'আজমীর এক্সপ্রেস' একটি লোকাল টাইপ ট্রেনে। পরের দিন সকালেই যেতে হবে তাই বাকি সময়টা কোলকাতা শহরে রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে বেড়াই। হাওড়া ও শিয়ালদাহ ছাড়া শ্যাম বাজারে আরও একটি নুতন স্টেশন খোলা হয়েছে নাম কোলকাতা, সেখান থেকেই আজমীর এক্সপ্রেস ছাড়ে। সময়মত স্টেশনে পৌঁছে খোঁজাখুঁজি করে আমাদের নামে রিজার্ভেশন দেখে উঠে পড়লাম। এক সঙ্গে উপরে নীচে বসা ও শোয়ার জন্য সীট দেওয়া আছে। একাক্রমে দুইদিন দুইরাত শেষে সকালে আজমীর পৌঁছলাম অনেক লম্বা জার্নি তবুও খুব খারাপ লাগে নাই। এটেন্ডেন্টরা খুব বন্ধুসুলভ ও সহায়ক। খাওয়া দাওয়া অর্ডারে সরবরাহ করা হয়। মান তত উন্নত নয় বেশির ভাগ রুটি-সবজি - চা খেয়েছি। স্টেশন থেকে টেক্সিওয়ালা আজমীর দরগাহ শরীফ গেটে আমাদেরকে নামিয়ে দেয়। ট্রেনে দেশি এক আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি মুতাওাল্লির বাসায় তাদের সঙ্গে যেতে বলেন। আমাদের সময় স্বল্পতায় দিনটা হোটেলে কাটিয়ে দরগাহ শরীফ জেয়ারত করে রাতেই আগ্রা রওয়ানা হওয়ার পরিকল্পনা করি।

দিনের জন্য হোটেলে উঠলাম। হোটেল থেকে একজন গাইড দেওয়া হল। তিনি আমাদেরকে দরগাহর ভিতর বাহির ঘুরে দেখালেন। অনেকেই অনেকভাবে ফুল, গিলাব, টাকা পয়সা ইত্যাদি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন। আমরা শরিয়ত সম্মতভাবে জেয়ারত করে ফিরলাম। আসার পথে সব বাহারি দোকান, নানা রকম খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায়। মেয়ে-নাতনীরা কিছু কেনাকাটা করে। মেয়েদের মা আজমীর শরীফ জেয়ারত করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর শোকারিয়াা আদায় করে আমাদেরকে ধন্যবাদ দেয়। আগ্রা যাত্রার সব ব্যবস্থা হোটেল ওয়ালারাই করে দেয়। সন্ধ্যা ৭ টায় বাসের টিকেট, বাকি সময় হোটেলে কাটিয়ে সময় মত টেক্সি এসে বাস স্টেশনে নিয়ে যায়। আমরা কিছুই চিনি না। সময় কমে আসে এবং আমাদের টিকেট চেক করে নির্ধারিত সীটে বসিয়ে যাত্রা শুরু করে। সীটগুলি অনেকটা ট্রেনের সীটের মতই উপরে নিচে প্রয়োজনে ঘুমানো যায়। বাসের শেষ গন্তব্য 'গোয়া আমরা নামবো পথিমধ্যে আগ্রা। রাত ৪ টায় আমাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হয়। পথের পাশে একটা ছোট কাউন্টারে নামিয়েই বাস চলে যায়। ভয়

ভয় লাগছিল কিন্তু হোটেলের ব্যবস্থা চমৎকার। তারাই আগ্রায় হোটেল বুকিং দেয় ও হোটেলের গাড়ি এসে আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে হোটেলে পৌঁছে দেয়। রাত প্রায় শেষ। প্রচন্ড শীত বাকি সময় হোটেলের লেপতোষক চাদর সব মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমালাম। কিছু মালপত্র কাউন্টারে ফেলে এসেছিলাম। খবর দেওয়ায় হোটেল থেকে গাড়ী পাঠিয়ে সেগুলি এনে দেয়। কিছুই খোয়া যায় নাই। অথচ ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের লাগেজ চেকিং এর সময় কীভাবে সুটকেসের ভিতর থেকে প্রায় হাজার খানেক ডলার চুরি হয়ে যায়, সে এক আশ্চর্য ব্যপার। সুটকেস ঠিকমতই তালাবদ্ধ ছিল।

সকাল ৮ টায় নাস্তা সেরে হোটেলের ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে আগ্রার বিখ্যাত ইতিহাস সচক্ষে দেখে চোখ প্রাণ জুড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ী খুব ভাল, ড্রাইভার খুব ভদ্র ও সহায়ক। সে বললো প্রথমে যাবে 'ফাতেহপুর সিক্রি' তার পরে তাজমহল।

'ফতেহপুর সিক্রির কাছাকাছি এক জায়গায় গিয়ে গাড়ী থামলো। সেখান থেকে গাড়ী আর এগুনোর অনুমতি নাই। গাইডসহ সেখানে ছোট ছোট টেক্সি অপেক্ষমান, একজন গাইডসহ টেক্সি চুক্তি করে সেখান থেকে নিয়ম অনুযায়ী বাকি রাস্তা পার হয়ে দুর্গে পৌঁছে গেলাম। মনে হলো টাকা কামানোর ফন্দি হিসাবেই এসব ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যথায় আমাদের গাড়ীতেই গন্তব্যে পৌঁছা যেত। ড্রাইভার সব কিছু চেনে। রাস্তাগুলি মনে হলো অনেক পুরানো গ্রাম্য রাস্তার মত, আশপাশ এলাকাও তেমন উন্নত নয়। মোগল বাদশাহদের বাসস্থান দুর্গটি বিশাল এলাকাজুড়ে উঁচু জায়গার উপর আরও অনেক উঁচু করে নির্মিত। মধ্যে বিশাল মাঠ। চারপাশে ঘোরানো দালান। খোপ খোপ সব কামরা। কামরাগুলি সব তালাবদ্ধ ভিতরে দেখার উপায় নাই। আকবর এর শয়নকক্ষ বাইর থেকে দেখলাম, পাশে মসজিদ। কিছু দূরে বারান্দায় আমীর-ওমরাদের কবর।

মাঠের পশ্চিম কোনায় কোন এক পীর সাহেবের মাজার, অনেক খাদেম, পয়সাকড়ির ধান্দায় ব্যস্ত। আরেক কোনায় দেখলাম ইতিহাস খ্যাত আনার কলির সুড়ঙ্গ। মুখটাই শুধু দেখা যায়। ভিতরে কিছু দেখার উপায় নাই। আমাদের সঙ্গী গাইড অনবরত বকবক করে যাচ্ছিল। চারপাশ ঘুরে দেখতে প্রায় বিকাল হয়ে আসছিল। পরবর্তী লক্ষ্য তাজমহলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

একইভাবে কাছাকাছি গিয়ে ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে দিল। সেখান থেকে রিকশায় যাত্রা। রাস্তার কোন উন্নতি নাই। একেবারে ভাঙাচোরা ও ঘিঞ্জি। দুই রিক্সা পাশাপাশি ক্রস করতে লেগে যায়। উভয় পাশে প্রচুর ছোট ছোট দোকান। লোকজন ভীড় করে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে গেটে পৌঁছে যাই।

রিককাওয়ালা তার ফোন নাম্বার দিয়ে বললো ফিরার সময় হলে ফোন করতে। কাউন্টার থেকে টিকেট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। ঘুরে ঘুরে ভিতরে প্রবেশ করলাম। কিছু দূর হেঁটে তাজমহলের বাইরের অংশ দেখলাম। পিছন ফিরে দেখি আমার মেয়েরা কেউ নাই। আমার সঙ্গে ফোনও ছিল না। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। তাই কী ব্যাপার দেখার জন্য বেরিয়ে আসলাম। তারা টিকেট নিয়েছিল ২০ টাকার। বিদেশীদের জন্য টিকেট নাকি ২০০ টাকা। তাই তাদেরকে ঢুকতে দেয় নাই। আবার টিকেট করে লাইন ধরে ঢুকার মত সময় ছিল না। তাই ভবিষ্যতে আর কোন সময় তাজমহল ভাল করে দেখার আশা রেখে ফিরে চললাম। ফেরার পথে ড্রাইভার আগ্রা ফোর্ট দেখতে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় এক দৌড়ে চারিদিক ঘুরে ফিরে এলাম। যে কয়দিন ছিলাম প্রত্যেকদিনই এক নিয়মে ঘুরেছি। সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে পথে সকালের চা-নাস্তা সারাদিনের জন্য; দুপুরে কোন খাবার নাই। মাঝে মধ্যে কিছু ফলমূল খেয়েছি। সন্ধ্যায় ফিরার পথে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফেরত। বেশ শীত, তাই তাড়াতাড়ি লেপ কম্বল মুড়ি দিতে পারলেই রক্ষা। কোন কোন সময় অতিরিক্ত লেপ কম্বল হোটেল থেকে চেয়ে নিতে হয়েছে। আগ্রায় ঐ রাত কাটিয়ে পরদিন দিল্লি যেতে হবে। হোটেল থেকে একটি ট্যুরিস্ট জিপ ঠিক করে দেওয়া হলো। দিল্লি যাওয়ার রাস্তা দুটা। একটা পুরানা রাস্তা ছয় ঘন্টা সময় লাগে। আরেকটা নুতন এক্সপ্রেস ওয়ে। সময় লাগে অর্ধেক। তবে ৫০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়।

সকাল সকাল রওয়ানা হলাম। ড্রাইভার 'যুগন্দর সিং বিসওয়াল খুব রসিক। আমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করে কাটায়। রাস্তা একেবারে সোজা। গাড়ী সর্বোচ্চ গতিতে শুধু স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকা। আর গল্প করা। ড্রাইভারের একটা উদ্দেশ্য ছিল পুরানা দিল্লিতে তার চুক্তি করা হোটেলে আমাদেরকে তুলে দিবে। বিনিময়ে তার একটা বখশিশ। কিন্তু যখন শুনলো আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, আমরা কেরল বাগে' ইন্ডিয়া হোটেলে বুকিং নিয়েছি তখন তার গল্প সল্প একবারে বন্ধ হয়ে যায়। মুখ গোমড়া করে বাকি রাস্তা আর একটি কথাও না বলে "ইন্ডিয়া হোটেলে' আমাদের পৌঁছে দিয়ে ভাড়াটা নিয়ে দ্রুত চলে যায়। হোটেল এর দোতলায় আমাদেরকে কামরা দেওয়া হয়। হোটেলের পরিবেশ ভাল। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। এলাকাটাও সুন্দর। রাস্তাঘাট প্রশস্ত। কোন ভীড় নাই। মনে হলো দিল্লীতে শেষ দিন ভালই কাটবে।

সকাল ১০টায় দিল্লি পৌছে গেছি। হোটেলেই চা-নাস্তা সেরে নিয়ে সারাদিনের জন্য হোটেল প্রদত্ত গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লাম। সব ড্রাইভারই বেশ ভদ্র

ও সহায়ক; মনে হলো তাদের দেশের পর্যটন খাত প্রসার লাভ করুক ঐ ব্যাপারে তারা খুব সচেতন। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও তারা কোন আপত্তি তোলে না। বরং হাসি মুখে মেনে নিয়ে চালিয়ে যায়। ঘুরাঘুরি অনেক হলো কিন্তু অল্প সময়ে ভিতরে ঢুকে সবকিছু দেখার সুযোগ কম। দিল্লির লালকেল্লা জামে মসজিদ, ইন্ডিয়া গেট, কুতুব মিনার বাইর থেকে দেখে মেয়েরা মার্কেটিং এর দিকে চলে যায়। আমার কোন চাহিদা ছিল না। তবু মেয়েরা আমরা জন্য কাশ্মিরি সাল কিনে। তাদের জন্য ও তাদের মায়ের জন্য কাপড় চোপড় ও সামান্য গয়না কিনে নেয়। সেলসম্যানরা খুব বন্ধুসুলভ। আমি চা খেতে চাইলে একজন বললো, 'বুজুর্গ লোক কো বড়া বড়া কাপসে চা-য়ে দে-না"। বড় বড় কাপে কয়েকবার চা খাওয়ানো হলো। বাইরে গিয়ে একজন বিড়ি টানছিল। আমাকেও একটা দেওয়া হলো, মনের সুখে টানলাম। সব জায়গায় বিড়ি টানতে সংকোচ হয়। তাদের বিধি নিষেধ আমাদের জানা ছিলনা পুরানো দিল্লি পুরান ঢাকার মতো। নতুন দিল্লি খুব সুন্দর। রাত্রে এক হোটেলে খাওয়ার জন্য ঢুকলাম। গরুর মাংস আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় তারা বললো এটা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কাছে। তাই এখানে গরুর মাংস বিক্রি হয় না। অগত্যা অন্যান্য আইটেম দিয়ে খাওয়া সারলাম।

পরের দিন সকালে দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার কথা, মাত্র সাতদিনের সফর এর এখানেই সমাপ্তি। আমাদের ভিসা এক মাসের ছিল কিন্তু আমার এক মেয়ে সরকারি কর্মকর্তার জিও ছিল মাত্র সাত দিনের। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে দিল্লি শহর কুয়াশায় ঘেরা। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এয়ারপোর্ট পৌঁছে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সারলাম। কিছুই চিনি না। মেয়েরা নিজের চেষ্টায় সব কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। বিশাল এয়ারপোর্ট। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে অনেকক্ষণ হাঁটতে হয়। সব রকম চেক সারার পর নির্ধারিত জায়গায় অপেক্ষায় থাকলাম। প্লেনে উঠার ঘোষণা হওয়ায় আমি ও আমার এক মেয়ে প্রায় ঢুকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি মেয়েদের মা-সহ অন্যরা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা হ্যান্ড ব্যাগে নাকি চেক সীল পড়ে নাই। তাই আটকে দেওয়া হয়েছে। আমার এক নাতনী ঝগড়া করছিল এই বলে যে এটা তো তাদের ভুল। চেকার বারবার টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিল- আমার নাতনীকে বলে যে এটা তার ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের লোক আসতে হবে। এদিকে বার বার ঘোষনা আসছিল নাম ধরে প্লেনে উঠার জন্য। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম হয়তো আজকে যাওয়াই হবে না। বেশ কিছু সময় উৎকণ্ঠীয় কাটিয়ে অবশেষে অফিসার আসলেন ও বিনাবাক্য ব্যয়ে হেসে হেসে আমাদের ক্লিয়ারেন্স দিলেন। হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলাম। প্লেনে গিয়ে উঠলাম। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেন বড়-সড় আরামদায়ক। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গিয়ে আকাশ পরিস্কার। বাইরে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে। ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের যাত্রা শেষে ঢাকা বিমান বন্দরে নামলাম। আমার মেয়ে পুলিশ অফিসার সঙ্গে থাকায় ইমিগ্রেশনে সময় নষ্ট বা অহেতুক হয়রানীর বদলে অল্প সময়ে সহজে সব কাজ সমাধা হয়। অবশ্য আমরা অন্যায় বা অবৈধ কোন কাজ করি নাই বা করার অভ্যাসও নাই। আর এক মেয়ের গাড়ি বাইরে তৈরী ছিল রওয়ানা হলাম। কিন্তু রাস্তার জ্যামের কারণে ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছতে লেগে গেল ৩ ঘন্টা। ভাল করে সময় নিয়ে ভারত ঘুরে দেখার সুযোগ হলো না বলে আফসোস থেকে গেল। মনে মনে আরেকবার আরও বিস্তারিত ভারত দেখার একান্ত আগ্রহ পোষন করি।

সামাজিক দায়িত্ব

১৯৭৫-এ কক্সবাজার থেকে চাকরি ছেড়ে স্থায়ীভাবে চুনতির বাড়ীতে চলে আসি। এ পর্যন্ত ডেপুটি পাড়া সমাজ প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন কাজেম আলী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আয়ুব খান। তিনি স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করায় সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছিল। সমাজ বাসীর অনুরোধে আমাকে এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়; সঙ্গে মাতব্বর গোছের ১০ জনের একটি পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয়।

ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ সমঝোতার মাধ্যমে আপোস রফা করে দেওয়া এই পরিষদের কাজ। জটিল আকার ধারন করলে ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্য নেওয়া হয়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার সময় কোন রকম তহবিল ছিল না। সামাজিক চাঁদা ধার্য করে আমি একটি তহবিল গঠন করি। চাঁদা দেওয়ার সামর্থ না থাকলে জোর করা হয় না। বেশির ভাগ সামর্থ লোকেরাই চাঁদা দিয়ে থাকে। কোন মেয়ের বিয়ের সময় বর পক্ষ থেকে একটা সামাজিক চাঁদা নেওয়া হয়। এই চাঁদা থেকে আবার কন্যাদায়গ্রস্থ গরীব পরিবারকে সাহায্য করা হয়। অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম আমাদের সামাজিক গুদামে প্রস্তুত আছে। ডেকোরেশন থেকে কোন মালামাল আনার প্রয়োজন হয় না। কোন রকম ভাড়া ছাড়াই সমাজবাসীরা এসব সরঞ্জাম ব্যবহার করে। অন্য সমাজের লোকরা প্রয়োজনে কিছু চাঁদা দিয়ে সরঞ্জাম নিয়ে যেতে পারে। তহবিলে টাকা জমা হলে আরও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনা হয়।।

মসজিদ ফোরকানিয়াও সামাজিকভাবে পরিচালিত হয়। ঘটা করে কোন চাঁদা নেওয়া হয় না। ফোরকানিয়ায় কোন ছাত্র বেতন নাই। বিত্তবান লোকদের বার্ষিক অনুদানের ও দানকৃত জমির ওয়াসিলাত থেকে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এক্ষেত্রেও আমি কোন জমাকৃত তহবিলের অস্তিত্ব পাই নাই। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন ভাতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি নুতন করে তহবিল সৃষ্টি করি এবং নিয়মিত বেতন ভাতার ব্যবস্থা করি। প্রতি বছর বেতন ভাতা আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি করা হয়। উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয়। সংস্কার কাজ প্রয়োজন দেখা দিলে পারিবারিক সামাজিক দানশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন। কোন সমস্যা হয় না। সামাজিক বিয়ে শাদী, মেজবান ও বিপদ আপদে সবাই সহযোগীতা করে। বিত্তবানরা টাকা দেয়। সাধারণ মানুষ বিনা পয়সায় শ্রম দেয়। এভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে আমরা ছড়ার উপর দুইটি পাকা সেতুও নির্মাণ করেছি। গরীব ছেলেমেয়ে যারা মেধাবী ও লেখাপড়ায় আগ্রহী প্রয়োজনে তাদেরকে যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। এছাড়া মেধাবী ছাত্রদের জন্য আলাদা মাসিক ও বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

নৈতিক অবক্ষয়, মাতাপিতার প্রতি অবহেলা বা অসদাচরন, মাদকাসক্তি, বিপথগামীতা ইত্যাদি ব্যাপারে সামাজিকভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেয়া হয়। কোনভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বা কোন রকম বাড়াবাড়ি করা হয় না।

অভিযান

১৯৮০ সালের দিকে এলাকায় হঠাৎ করে চুরি ডাকতি ব্যাপক আকার ধারন করে। চুনতি থেকে আজিজনগর পর্যন্ত প্রায় প্রতিরাতে বহিরাগত সশস্ত্র ডাকাতরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ী ডাকাতি করতে থাকতো। চুনতির ভিতরেও বাড়ী ডাকাতি হতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা সামাজিকভাবে রুটিন করে বাধ্যতামূলক পাহারা বসাই। থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাহারাদারদের তালিকা থানায় জমা দিয়ে থানার সাহায্য সহযোগীতা চাওয়া হয়। প্রতিরাতে থানার টহলদল আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে।

ইতোমধ্যে একবার চুনতির ভিতর কয়েকটি বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে যায়। প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দুইটি লাইসেন্স করা বন্দুকসহ অনেক টাকা পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় ও মারধর করে। দুয়েকজন লোক বাধা দিতে গেলে তাদেরকে গুলি করে মারাত্মক জখম করা হয়।

এরপর আমরা আরও সতর্ক হই ও পুলিশকে আরও সজাগ হওয়ার জন্য অনুরোধ করি। একদিন খবর পাওয়া যায় আশপাশ এলাকায় পাহাড়ের ভিতর ডাকাত ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। আমরা অনুমান করলাম আজ রাত ডাকাতি হতে পারে। আধুনগর পর্যন্ত খবর পাঠালাম। পুলিশকে ও জানালাম। আমরা একদল সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ীর কাছেই পুকুরের ঘাটে পাহারায় থাকলাম। তারিখটা আমার এখনও মনে আছে । ০৭/০৫/১৯৮২ ইং, রাত ১ টা বেজে ৫ মিনিট। ডাকাত দল ঢুকে গেছে। আমরা জানি না। হঠাৎ বিকট আওয়াজে এক বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ডাকাত ভিতরে ঢুকে যায়।

আমার লাইসেন্স করা বন্দুক গুলি ভরা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি পর পর দু'বার ফাঁকা আওয়াজ করি। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল, তাই আমার গুলির শব্দ শুনে পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক মসজিদের মাইক থেকে ডাকাতির ঘোষনা দেওয়া হয়। প্রায় শ'দুয়েক মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাকাতরা অবস্থা বেগতিক দেখে খালের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। ঘন্টা খানেক পর আবার বনপুকুর এলাকায় হৈ চৈ উঠে, ডাকাতরা সেখানে হানা দিয়ে রান্না করা খাবার, চালডাল, মুরগী নিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা ঐ এলাকায় পৌঁছে পুলিশ টহল দলের দেখা পাই। স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বাররাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা পরামর্শ করে ডাকাতের পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছু লোক ট্রাকে করে কিছু লোক পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। পথে পথে আমাদের দল ভারী হতে থাকলো। দুই তিন মাইল দূরে 'শুয়র মারা' নামক পাহাড়ী জায়গায় পৌঁছে খবর পেলাম ডাকাতদল কিছুক্ষণ আগে ঐ পথে পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকে গেছে। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। আমরা শপথ নিলাম যত গভীরে যেতে হয় যাবো- ডাকাত ধরবোই। আরও তিন মাইল গভীর পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে একটি ছোট খামার বাড়ীর পিছনে গিয়ে পুলিশসহ আমরা পজিশন নিলাম। বেড়ার ঘর, চারিদিকে গভীর জঙ্গল, ঘরের ভিতর মৃদু কথাবার্তা শুনা যাচ্ছে। একটু পরে মোরগের ডাক শুনা যায়। ডাকাতরা সেখানে লুট করে আনা খাবার খাচ্ছিল, কেউ কেউ বিশ্রাম করছিল। সামনে বন্দুক নিয়ে সেন্ট্রির মত দু'জন পাহারায় ছিল।

আমরা সংখ্যায় ছিলাম মাত্র ৬ (ছয়) জন, বাকি প্রায় দু'শ জন আসল জায়গা না চিনে অন্য পথে চলে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে ৮ (আট) জন সশস্ত্র পুলিশ ও অনেক বন্দুকধারী ছিল, আমরা ৬ (ছয়) জন এর মধ্যে মাত্র ১ (এক) জন সাহসী পুলিশ তাজুল ইসলাম খামার এর পিছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতেই একজন ডাকাত সেন্ট্রি তাকে গুলি ধরে, দেরী না করে করে সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি করে ডাকাতকে

ধরাশায়ি করে, ২য় সেন্ট্রি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসলে তাকেও গুলি করে। ১ম ডাকাত গুলিতেই মারা যায়, ২য় জনকে জীবন্ত ধরা হয়। বাকি ডাকাতরা পালাতে থাকে। এই সময় অন্য পাশে থাকা আমাদের লোক ও পুলিশ পলায়নরতদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলি করতে থাকে। অনেকে আহত হয়ে পালিয়ে যায়। ২(দুই) টি বন্দুক অসংখ্য গুলি ও লুট করা মালামাল জব্দ করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। ইতোমধ্যে সেখানে এসপি সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইন মতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অনেকদিন ধরে নানান ঝামেলা চলতে থাকে। বিভিন্ন রকম অনুসন্ধান, মামলা-মোকাদ্দমা পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমার বাড়ীতে বসে প্রস্তুত করে। তারপর শুরু হয় মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া, তখন সামরিক আইন চলছিল, সামরিক আদালতে আমরা কয়েকবার সাক্ষ্য দিয়েছি, তারপর চট্টগ্রাম জজ কোর্টে মামলা স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ১২(বার) বছর মামলা চলে ও আমরা সাক্ষ্য দিতে থাকি। ডাকাতের জামিন হয় নাই, ১২ (বার) বছর হাজতবাস করে আরও ১২(বার) বছর সাজা হয়।

হাজতে থাকা অবস্থায় ঐ ডাকাতটিকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা হয় ও তার জবানবন্দি নিয়ে আরও অনেক ডাকাত ধরা হয়। এরপর ১০ বছর পর্যন্ত এই এলাকায় আর কোনরকম ডাকাতি হয় নাই। ১৯৯০ সালের পর পুনরায় আরাকন সড়ক এর 'জাঙ্গালিয়া এলাকায় সড়ক ডাকাতি শুরু হয়। ক্রমে এই ডাকাতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এলাকাবাসীর ঘুম হারাম করে দেয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এলাকাবাসীদেরকে নিয়ে মিটিং করে সহায়তা চায়। যাদের কাছে লাইসেন্স করা বন্দুক আছে তাদেরকে নিয়ে পুলিশসহ টহল দল গঠন করা হয়। পুলিশের এএসপিসহ এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। একদিন আরাকান রাস্তার পশ্চিমে ১ (এক) মাইল ভিতরে গভীর জঙ্গলে অভিযান চালানো হয়। আগের রাতে বাড়ী ডাকাতি করা মালামাল ডাকাতদের স্ত্রীরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে কিছু পুরুষ ও ছেলেমেয়েও ছিল আমরা তাদের দেখতে পেয়ে পুলিশকে গুলি করতে বলি। কিন্তু ঐ অবস্থায় গুলি করা সম্ভব নয় বলে পুশি গুলি করে নি। তারা আমাদের দেখে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। আর একদিন খবর পাওয়া যায় ঐ এলাকার কাছাকাছি একটি খামার বাড়ীতে ডাকাতরা অবস্থান করে। রাত তিনটার সময় আমরা গিয়ে সেখানে হাজির হই। দুর্ভাগ্য আমাদের আগে আগে একটি বিশাল দাঁতাল হাতি ঐ খামারটি ভেঙ্গে ফেলায় ডাকাতরা পালিয়ে যায়। এর পরের দিন আসে সাফল্য, একদল ডাকাত রাস্তার পাশেই একটু জঙ্গল এলাকায় লুকিয়ে রাস্তার অবস্থা দেখছিল। আমাদের দলের একজন সাহসী পুলিশ শামসু মিয়া অপর পাশ থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একাই খুব সাবধানে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় একজন

ডাকাত দোনালা বন্দুক নিয়ে গাছের উপর বসে আছে। হঠাৎ ডাকাতটি পুলিশ দেখে বন্দুক তাক করে। সাবধানী পুলিশ দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার, ডাকাত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, বন্দুকটি অনেক গুলিসহ উদ্ধার হয়। সেই থেকে বর্তমান পর্যন্ত বড় ধরনের আর কোন ডাকাতি এই এলাকায় সংগঠিত হয় নাই। বর্তমানে আবার শুরু হয়েছে গরু ডাকাতি; আমি এক রাত্রে বাড়ী ছিলাম না। সেই রাতেই আমার বাড়ী থেকে একটা উন্নত জাতের গাভী চুরি হয়। আমি বাড়ীতে থাকলে হয়ত চোরেরা উপযুক্ত শিক্ষা পেত। আশপাশ এলাকায় কিছু কিছু চোর ধরাও পড়েছে, চকরিয়া এলাকায় এক চোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তবুও চুরি বন্ধ হয় নাই। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদে অংশগ্রহণ

চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ে একবার সভাপতি হয়ে প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠন করি। পরে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হই। এই পদে একাধারে ১৫ (পনের) বছর ছিলাম। যোগ্য প্রধান শিক্ষকের অভাবে কাজ কর্মের অসুবিধা হচ্ছিল। জয়দত্ত বড়ুয়া নামে এলাকার নামজাদা একজন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করি। এরপর থেকে বিদ্যালয় উন্নয়নে কর্মকান্ড এগিয়ে যায়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয় তহবিলের উন্নতি হয়। সরকারী-বেসরকারী ও এলাকাবাসীর সহায়তায় বিদ্যালয় ভবন সংস্কার, পুকুর খনন, জমি খরিদ ও প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মান করা হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনাব ডাক্তার নুরুল আলম। সহযোগী ছিলেন সর্ব জনাব এস্তফা আলী মিয়া, মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া, কাজেম আলী মাষ্টার প্রমুখ। জমি দান করেছিলেন এস্তেফাজুর রহমান খান সাহেবের ছেলেরা প্রথমদিকে ক্লাস নেওয়া হতো জনাব মোহাম্মদ ইউনুস খানের পুরানা কাচারী ঘরে। পরে দানকৃত পাহাড়ী জমিতে মাটির গুদাম ঘর নির্মাণ করে স্থানান্তর করা হয়। এই সময় আমার আব্বা জনাব কবির উদ্দিন আহমদ খান সহ অনেক অবৈতনিত শিক্ষক ছিলেন। আমরা ৬০ (ষাট) এর দশকে ছাত্র ছিলাম। ছনের ছাওয়া চাল থেকে বৃষ্টির দিনে পানি ও মাটি একসঙ্গে পড়ে আমাদের কাপড় চোপড়, বইখাতা নষ্ট হয়ে যেত। তখন আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু যোগেশ চন্দ্র পাল, ওনার মত বিদ্যান ব্যক্তি অতি বিরল। ওনার কাছে যা ইংরেজি শিখেছি আজীবন ভুলবার নয়। পূর্বে উল্লিখিত সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দের

পরে সেক্রেটারী হিসাবে বিদ্যালয়ের হাল ধরেন আমার ফুফাতোভাই জনাব আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যাকে সবাই আদর করে ডাকতেন বাদশা ভাই। তাঁর আমলে বিদ্যালয়ের চেহারায় আমুল পরিবর্তন আসে। দাউদ করর্পোরেশনের সহায়তা নিয়ে বিদ্যালয়ের ১ম পাকা ভবন নির্মাণ করেন। ডিসি সাহেবকে অনুরোধ করে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য আরও ৫ (পাঁচ) একর পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তী করে দেন। নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান ও নিয়ম শৃংখলা রক্ষায় তিনি কঠোর নজরদারী চালিয়ে যান, অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও যোগেশ বাবু চাকরী ছেড়ে দেওয়ায় সাময়িক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় পরিচালনায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সময় বাধ্য হয়ে আমি বিদ্যালয় পরিচালনায় সংযুক্ত হই ও বাবু জয়দত্ত বড়ুয়াকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়ে নতুন উদ্যোগে উন্নয়নেন কর্মকান্ড চালিয়ে যাই। বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করি। এই কাঠ টিনের ছাওয়া প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মানে ও ক্লাসের জন্য টুল-টেবিল নির্মানে কাজে লাগাই। কিছু কাঠ বিক্রি করে মিস্ত্রি খরচও পাওয়া যায়। পথিকৃৎ বনায়ন প্রকল্প' এর আওতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সমস্ত খালি জায়গায় গাছ লাগিয়ে দিই। এছাড়া বন্দোবস্তিকৃত সমস্ত টিলা পাহাড় এলাকাও বনায়ন করা হয়, পরবর্তীতে ঐ সমস্ত গাছ বিক্রি করে বড় অংকের টাকা বিদ্যালয় উন্নয়নেন কাজে ব্যয় করা হয়। ১৫ (পনের) বছর বিদ্যালয়ের সেবা করে আমি স্বেচ্ছায় অবসর নিই; জয়দত্ত বাবু অনেক অনুরোধ করা সত্বেও পরবর্তী টার্মের জন্য আমি আর আগ্রহ না দেখিয়ে সরে আসি, এই ভেবে যে অন্যদেরকেও দেশ সেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এরপর চুনতি মাদরাসায় কিছুদিন 'গভর্নিং বডির সদস্য হয়ে কাজ করেছি। চুনতি মাদরাসা একটি ঐতিহ্যবাহী অনেক বড় প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এখানে নানারকম সমস্যাও অনেক। এইসব সমস্যার সমাধান দিতে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাসাধ্য আন্ত রিক প্রচেষ্টা চলতে থাকে। দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে; স্থান সংকুলান হয় না। পুরানা দালান ভেঙ্গে পড়ে। সরকারী-বেসরকারী দানশীল ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় পুন:নির্মাণ করা হয়। চুনতির যে-কোন গঠনমূলক কাজে চুনতির সর্বস্তরের মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। যার যার সামর্থ অনুযায়ী টাকা খরচে কার্পণ্য করে না।

গরীব জনসাধারণ টাকা দিতে না পারলে বিনা পারিশ্রমিকে কায়িক শ্রম দেয়। তাই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলে চুনতির কোন কাজ আটকায় না। শেষ পর্যন্ত

সব কাজই সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়। চুনতি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর নেয়ার কথা বলেছি। বর্তমানে কলেজ গভর্নিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে কর্মরত আছি। চুনতির সর্বস্তরের মানুষের একান্ত আপন মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদিন বাচ্চু ভাই মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সামরিক সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন। চুনতির যে-কোন সমস্যা ও আবদার রক্ষায় প্রাণপন প্রচেষ্টা চালান। তিনি সহকারী সামরিক সচিব থাকাকালীন কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মান করা হয়; এই সময় আমার চাচীআম্মা বেগম সুফিয়া কামাল কলেজকে তাঁর কলেজ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাচ্চু ভাই সামরিক সচিব হওয়ার পর থেকে কলেজের ব্যাপকতর উন্নয়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান হিসাবে কলেজকে সরকারীকরণ করা হয়েছে; চুনতিবাসীর জন্য এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বর্তমানে আধুনগর গুল-এ জার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়ীত্ব অপেক্ষাকৃত তরুণদেরকে ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বসা ছিলাম। ঠিক এই সময় 'গুল-এ জার উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে তাদের বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বটা কাঁধে তুলে দেন। সেই থেকে এই পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব কাঁধ থেকে নামাতে পারি নাই। টার্ম ফুরিয়ে গেলে একরকম জোর করে পুন:নির্বাচিত করা হয়। বিদ্যালয়টি চুনতি আধুনগর ইউনিয়ন এর সীমায় আরাকান রাস্তার পাশে অবস্থিত। ডা: মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ স্থানীয় কিছু দানশীল ব্যক্তি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যালয়টির অবস্থান অতি অল্প জমির উপর তাই সম্প্রসারণ কাজের প্রচেষ্টা থাকলেও উপায় নাই; বালিকা বিদ্যালয়ে কোন ফি নেওয়া হয় না তাই আর্থিক অবস্থা দুর্বল। পার্শ্ববর্তী জমি কিনে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অতি মাত্রায় দাম চাওয়ায় সম্ভব হয় নাই। আমার একজন জুনিয়র বন্ধু মাহমুদুর রহমান প্রধান শিক্ষক থাকাকালে আমাকে ধরে এনে সভাপতি বানানো হয়। তারপর থেকে উভয়ে মিলে বিদ্যালয় উন্নয়নেন প্রচেষ্টা চালাই। আমার এক ভাই ড: শফিক আহমদ খান মানিক মিয়া মারা যাওয়ার পরে ভাবীও ছেলেমেয়েরা তাঁর নামে কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি ও হেড মাস্টার ভাবীকে এই স্কুলে কিছু করার অনুরোধ জানাই। তিনি রাজী হয়ে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ে একটি

পাঠাগার ও নামাজঘর নির্মিত হয়। প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সরকার প্রদত্ত দুটি একতলা ছোট ছোট ভবন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দিন দিন ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে; স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাছাড়া ভবনের ছাদ পুরানা হয়ে পানি চুইয়ে পড়ে অফিস ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট হচ্ছিল। নিজস্ব তহবিল কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে একটি ভবনের উপরে অস্থায়ী টিনশেড হল ঘর নির্মান করে কোন রকম কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পার্শ্ববর্তী আরেকটি ভবন অপেক্ষাকৃত মজবুত হওয়ায় স্থায়ীভাবে ছাদসহ দোতলা নির্মান সম্ভব। এই লক্ষ্য সামনে রেখে চাঁদা সংগ্রহ শুরু হয়। আমাদের নাতি ইঞ্জিনিয়ার শোয়েব ও সাকিব তাদের আব্বার নামে 'ওয়াহিদ ফাউন্ডেশান এর মাধ্যমে সেবামূলক কাজকর্ম করেন। বিদ্যালয়টি তাদের বাড়ীর কাছেই অবস্থিত। অনুরোধে 'ওয়াহিদ ফাউন্ডেশান' থেকে ৩,০০,০০০/= (তিনলাখ) টাকা পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দোতলার কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু টাকা তো আরও অনেক দরকার; মহাচিন্তায় পড়লাম। হঠাৎ আমাদের আর এক ভাবী ও ছেলেরা নিজেরাই এই কাজে অংশ নেওয়ার আগ্রহ দেখায় ও ৬,০০,০০০/= (ছয়লাখ) টাকার চেক পাঠায়। এই টাকায় ভবনের কাজ শেষ করা হয়েছে। ফিনিশিংয়ের কাজগুলো বাকি। আর কিছু দানশীল ব্যক্তির সহায়তা পাওয়া গেলে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করি। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন তরুণ কর্মোদ্দোমী; এছাড়া পরিচালনা পরিষদ সদস্য প্রবীন বন্ধু শাহাবুদ্দিন, তরুণ স্নেহাস্পদ ফরিদ, নাজিম, হায়াত প্রমুখ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা সবাই বিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চলমান রাখে। আমার সভাপতি হিসাবে সময় শেষ হয়ে আসলে অব্যাহতি চাইলে ফরিদ ভাই বারবারই বলে "আপনাকে ছাড়াছাড়ি নাই" চমৎকার বন্ধুসুলভ পরিবেশ, কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। সব পরীক্ষায় পাশের হারও ভাল, প্রায়ই শতভাগ পাশের কৃতিত্ব থাকে। আমি নিজেও মাঝেমধ্যে ক্লাস নিই; ব্যবহারিক ইংরেজি, বাংলা বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। আজকাল এসব ব্যপারে প্রায়ই উদাসীনতা ও অসচেতনতা দেখা যায়, সর্বত্র ভুল উচ্চারণের কারণে বানান ভুলের ছড়াছড়ি। সুযোগ পেলেই আমি এসব কথা বলি, অনেকে এই কারণে আমাকে হয়তো অপছন্দও করতে পারেন। যাহোক ছাত্রছাত্রীদের ভালর জন্য আমার এই প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে যাবো। শিশুকাল থেকে যাতে সঠিক উচ্চারণে সুন্দর ইংরেজী বাংলা ভাষা শিখে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা কয়েকজন মিলে চুনতিতে ছোটদের জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। নাম দেওয়া হয়েছে "মিলেনিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল"। আবাসিক অনাবাসিক উভয় ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। বর্তমানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়েছে। নিজস্ব কেনা জায়গার উপর দোতলা ভবন পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের ব্যক্তিগত অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অনেক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয় না। প্রথমদিকে বাছাই করে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ নিয়ম চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। গড্ডালিকা প্রবাহ চালু হয়ে যায়। প্রভাবশালী পরিচালক ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিককে আমি অনুযোগ করি 'আমার সদিচ্ছার বাস্তবায়ন তো হচ্ছে না এবং এর উল্টোটা করা হচ্ছে।" তিনি বলেন- বিদ্যালয় তো চালাতে হবে সুতরাং বাজারে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় নাই। গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরা অসচেতন, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কোন খবর রাখেন না, খরচ একটু বেশি হলেই অভিযোগ। অপর পক্ষে ভাল অংকের টাকা না পেলে কোন যোগ্য শিক্ষক ধরে রাখা যায় না। প্রথম দিকে ভাল মানের শিক্ষকদের প্যানেল গঠন করে বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়; চারিদিকে সুনামও ছিল, ক্রমে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করে অপেক্ষাকৃত ভাল প্রস্তাব পাওয়ায় সরে পড়ে; শহর এলাকায় চাকরীর পরে কোচিং ও প্রাইভেট পড়িয়ে প্রচুর রোজগার করা যায়। তাই ভাগ্যান্বেষন।

আমাকে প্রথমে 'একাডেমিক ডাইরেক্টর, কো-চেয়ারম্যান বর্তমানে চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে কোনরকম হাল ধরে আছি। সবাই ব্যস্ত, তাই পরিচালকদের ঈদ কোরবান ছাড়া সহজে দেখা মেলে না। স্নেহস্পদ অধ্যক্ষ ইলিয়াছ ও নিবেদিতপ্রাণ ফরিদকে নিয়ে অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। যোগ্য ব্যক্তিরা গ্রামে থাকে না সবাই শহরবাসী; আমি একজন-ই বেকার, গ্রামে পড়ে আছি, যেদিকে প্রয়োজন ব্যবহৃত হই। আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ব্যক্তিগত কোন লাভালাভ নেই। বিদ্যালয় এর সার্বিক কল্যানে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালু রেখেছি। ছাত্র সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে বলে ভবন সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ঋণ নিয়ে দুইটি গাড়ী কিনেছি; একটির ঋণ পরিশোধিত অপরটির চলমান। বর্ধিত বেতন এর দাবী, হোস্টেল খরচ, গাড়ী খরচ ইত্যাদি সামাল দেওয়া কষ্টকর। পরিচালকেরা প্রথমদিকে যে টাকার যোগান দিয়েছেন তার সিকি পরিমাণও পরিশোধ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবু সবাই সেবার মনোভাবে অটল আছেন বলেই রক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল

মোটামুটি ভাল। পাশের হার শতভাগ। অতিরিক্ত সাফল্যও প্রায়ই দেখা যায়। বৃত্তিও কেউ কেউ পেয়ে থাকে। বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি উদযাপিত হয়। ছোট ছোট বাচ্চাদের অভিভাবক প্রায় সবাই মায়েরা ও কিছু সংখ্যক বাবারা পরিষদ সদস্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিজ্ঞদের বক্তব্য শুনে কাজ করার প্রেরণা পাই। হতাশার মধ্যে আবার জেগে উঠি, কাজে লেগে যাই। কাজ করতে ভালোবাসী, কাজে লেগে থেকে আনন্দ পাই।

২০০৭-এ দুর্নীতি দমন কমিশন দেশের সকল উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করে লোহাগাড়া উপজেলায় ৯ (নয়)সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে আমাকে সভাপতি করা হয়। বর্তমান পর্যন্ত স্বপদে বহাল আছি। মেয়াদ শেষে পুন: অনুমোদন দেয়া হয়। ছোটকাল থেকে ন্যায়নীতি চর্চার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত করে শিশুদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সমূহে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয় তাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠানাদি করে দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা করা হয়- স্লোগান শিখানো হয়। উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় স্কুল কলেজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে দুর্নীতি বিরোধী দিবস সমূহ পালন করা হয়। আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে গোপন রিপোর্টে পাঠিয়ে ব্যবস্থ নেওয়ার সুপারিশ করা যায়। এভাবে একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মামলা বিচারাধীন আছে। সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে লোহাগাড়া উপজেলা মিলনায়তনে এক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলায় বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে সামনাসামনি অভিযোগ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছে ও তারা যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক, জেলা প্রশাসকসহ দুর্নীতি দমন কশিনের কমিশনার মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এটা একটা কার্যকর হুশিয়ারী প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ জনগণের জন্য হয়রানিমুক্ত পরিবেশে কিছুটা হলেও ভালো সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সীরতুন্নবী (স.) প্রতিষ্ঠা করেন চুনতির শাহ সাহেব নামে পরিচিত হযরত আলহাজ্ব শাহ মৌলানা হাফেজ আহমদ (রা:) ১৯৭২ সালে। এটি একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্বে যেই নাম কেউ জানতো না; সীরতুন্নবী (স.) - এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর রসুল (স.) এর জীবন চরিত। এই বিষয়ের উপর প্রতিবছর ১৯ (উনিশ) দিন ব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হয়। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত আলেম

ওলামা, জ্ঞানীগুণী, গবেষক ও অধ্যাপকবৃন্দ সারগর্ভ আলোচনা করেন। ছাত্ররা খাতা-পত্র নিয়ে হাজির থেকে প্রয়োজনীয় নোট নেয়। ১৯দিন ব্যাপী খাওয়া দাওয়া, বক্তাবৃন্দের আসা-যাওয়ার খরচ, সম্মানী ও অন্যান্য খরচ মিলে বিশাল অংকের টাকা খরচ হয়। শাহ সাহেব কেবলা কোন ধন-সম্পদ বা নগদ পয়সা রেখে যান নাই বা এখানে কোন রকম ব্যবসাও করা হয় না। এই বিশাল অংকের টাকা সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্তভাবে জনগণের চাঁদার মাধ্যমে যোগান দেওয়া হয়। প্রথমদিকে ধার করে কাজ শুরু করা হয়। মাহফিল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান হয়ে যায়, ঋণ ও থাকে না জমাও থাকে না। শাহ সাহেব কেবলার নিষেধ জমা খরচের কোন বাজেট আগে থেকে করা যাবে না। আল্লাহর উপর নির্ভর করে কাজ শুরু করতে হবে ও শেষ করতে হবে। এতেই শাহ সাহেব কেবলার কেরামতি প্রকাশ পায়। তিনি জীবিত থাকতে সবকিছু দেখাশুনা করতেন। পকেটে হাত দিয়ে যত টাকা থাকে সব বের করে দিতেন। মারা যাওয়ার পরে মাহফিলের জৌলুস একটুও কমে নাই বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। এলাকার লোকজন সবাই স্বেচ্ছা শ্রমে দিনরাত রুটিন করে কাজ চালিয়ে যায় কোন পারিশ্রমিক নেয় না। বিশাল মাঠ জনসমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সমাপনী রাত্রে সারারাত আলোচনার পর মিলাদ ও আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে গুণাহ মাফ চাওয়া ও সমবেত জনতার কান্নাকাটি ও আমিন - আমিন ধ্বনিতে বাতাস ভারি হয়ে উঠে। মনে হয় যেন সমস্ত গুণাহ থেকে আল্লাহর রহমতে আজকে মুক্ত হয়ে গেলাম। মাঠের পাশে বিশাল মসজিদে বায়তুল্লাহ' সংলগ্ন শাহ সাহেব কেবলার মাজার রয়েছে। নিজেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন কবরে যেন কোন রকম 'বেদআত' কাজকর্ম না হয়। নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করা হয়। অন্যপাশে রয়েছে রান্নাবান্না ও খাওয়ার প্যান্ডেল। আনুমানিক পঁচিশ হাজার লোকজন একসাথে খাবার সারতে পারে, সেই অনুপাতে স্বেচ্ছাসেবকরাও সদা প্রস্তুত ও কর্মরত থাকে। মহিলাদের জন্য শাহ মঞ্জিলের ভিতরের উঠানে সম্মানজনক ব্যবস্থা আছে। নাম দিয়েছেন শাহ সাহেব কেবলা নিজেই বায়তুল ইজ্জত'।

সীরাতুন্নবী (স:) ও সীর মাহফিলের আমিও একজন নগণ্য সেবক। এখানে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম ও দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়। যাবতীয় কাজকর্ম ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য

নিয়োজিত রয়েছে বিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত 'মোতাওয়াল্লী কমিটি ও 'নির্বাহী কমিটি'। হিসাবের দায়িত্বে ছিলেন প্রথম থেকে মামা মুসলিম খান। একজন অত্যন্ত দক্ষ, নীতিবান ও সৎ ব্যক্তি হিসাবে তিনি এক কানা কড়িও ছাড় দেওয়ার পক্ষে নন। আমি তাঁর পাশে বসে খাতাপত্র দেখতাম। কিছু শিখতাম ও মামাকে সহায়তা করতাম। আমি ঐ লাইনের লোক না হলেও মামার সঙ্গে থেকে "ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার সুবাসে হইনু খাঁটি"। পরে জেনেছিলাম তার নাকি মনে মনে ইচ্ছা ছিল হিসাব প্রধানের দায়িত্বটা তার মৃত্যুর পর যেন আমার কাধে তুলে দেওয়া হয়। মামার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী "মোতাওয়াল্লী কমিটি" সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে সীরতুন্নবী (স:) এর কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্বে নিয়োজিত করে। সাধারণ জনগণের টাকা যাতে যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় সে উদ্দেশ্যে আমি আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাহফিল শেষে কোন এক সুবিধাজনক সময়ে সবাইকে ডেকে আয় ব্যয়ের হিসাব জানিয়ে দেওয়া হয়। আর সারা বছর অন্যান্য ছোটখাট অনুষ্ঠানের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থাও একই হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কয়েকজন বেতনভুক্ত অফিস সহকারী রয়েছে, তারা যাবতীয় ফাইলপত্র সংরক্ষণ করে। আমরা সবাই স্বেচ্ছাসেবক। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে অডিট টিম গঠন করে হিসাবের অডিট করা হয়।

শোকারিয়া

আমার আব্বা শতভাগ সৎ এবং নীতিবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা আব্বার ১৪ (চৌদ্দ) জন সন্তান, কঠোর আর্থিক অনটনের কারণে সবার ভাগ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হয় নাই। চুনতি হাইস্কুলে এসএসসি পাশ করা পর্যন্ত আব্বা কষ্ট করে খরচ যুগিয়েছেন। ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজনদের বাসায় থেকে ও তাদের আর্থিক সাহায্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করেছি। বয়সে আমার অনেক ছোট কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমার ভাতিজা ড: সুলতান হাফিজ রহমান আমার কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবরকম সমর্থন যুগিয়েছেন, শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করলে তার প্রতিদান হয় না। তাঁর আম্মা মহিয়সী নারী আমার ভাবি আমাকে ও পরিবারকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন, আমার সন্তানদের প্রমোট করার জন্য হাফিজকে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ স্নেহশীলা ভাবিকে বেহেস্তবাসী করুন। আমীন।

আমি পৈত্রিকসূত্রে কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। পেয়েছি শুধু মা-বাবাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অকৃত্রিম দোয়া ও ভালোবাসা, আল্লাহ রব্বল আলামিনের উপর একান্ত নির্ভরতা রেখে সারা জীবন পরিশ্রম করেছি একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। কারও কাছে হাত পাতি নি, প্রতিদান পেয়েছি। আল্লাহর রহমতে আমার কোন আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ নাই। আব্বা বলতেন যেন বেশি পয়সাওয়ালা হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহলে বিপদের আশংকা থাকবে। যাতে অভাবেও পড়তে না হয় কাজ করে প্রয়োজন অনুযায়ী রোজগার করার জন্য যাতে সচেষ্ট থাকি। তাই করেছি। পয়সাওয়ালাও হই নাই- বেশি অভাবগ্রস্থও হই নাই।

মাঝেমাঝে ভাবি, নিজের জীবনটাকে স্বপ্নের মত মনে হয়! এই সেই দিন ছিলাম ছাত্র, ক্রমে ৮ (আট) ছেলেমেয়ের জনক, সবাই আল্লাহর মেহেরবাণীতে উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত, কারও কোন অভিযোগ নেই, সবাই তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ। ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ তেমন বেশি ছিল না কারণ তারাও আমার মত ভাইবোনদের সমর্থন পেয়েছে। মেয়েরা বিয়ের পর জামাইদের সমর্থনে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক খরচে তাদেরকে লেখাপড়া করানোর প্রয়োজন পড়ে নাই - সবাই চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ক্রমে এসএসসি পাশ করে সরকারি কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হওয়ায় কম খরচে কার্যসিদ্ধি হয়েছে। আমার উপর কোন আর্থিক চাপ আসে নাই। কাজ করে গিয়েছি, এবং করছি; পরিশ্রমের ফল এখনও পাচ্ছি, প্রয়োজনীয় খরচের সংস্থান হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরাও নিয়মিত দেখাশুনা ও অংশগ্রহণ করে। বেগম সাহেবা ধৈর্য্য ধরে দোয়রত আছেন। সাময়িক কষ্টে ধৈর্য হারান নি। তাই বর্তমানে আমরা উভয়ে যা পেয়েছি তাতে আলহামদুলিল্লাহ - আল্লাহ অনেক ভাল রেখেছেন।

কর্মজীবনের পুরো সময়টাই গ্রামের বাড়ীতে কাটিয়েছি। সাধারণত শিক্ষিত লোকেরা গ্রামের বাড়িতে থাকেন না, তাই গ্রাম এলাকার উন্নয়নের দিকে খেয়াল থাকে না। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছাই এরকম ছিল, আমি গ্রামে থাকায় উন্নয়নমূলক অনেক কাজে অংশ নিতে পেরেছি; কোনরকম রাজনীতি বা নির্বাচন না করেও সাধারণ জনগণের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামান্যতম সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তৃণমূলের জনগণ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক ভালবাসা, সম্মান শ্রদ্ধা সবই পেয়েছি। আমিও স্তরভেদে সকলের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছি।

গরীবদের কাছে টানতে চেষ্টা করেছি। অভাব অভিযোগ সাধ্যমত মেটাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছি, না পরলে মিষ্টি কথা শুনিয়েছি, কারও সঙ্গে কোনদিন খারাপ আচরণ করি নি। "সকলের সাথে বন্ধুত্ব – কারও সাথে শত্রুতা নয়" আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাই আমার কোন শত্রু নাই, কেউ আমাকে শত্রু মনে করলেও আমি তাকে বন্ধু মনে করি। আমার ছেলেমেয়েদেরও আমি এরকম শিক্ষা দিয়ে থাকি।

আমার আর কিছু চাওয়ার নেই; বেগম সাহেবা মাঝে মধ্যেই বাড়ীঘরের চাহিদা ও সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে অনুযোগ করতেন, বর্তমানে খুশি আছেন। সুতরাং আমরা তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, বাকি জীবন যাতে সবার শুভেচ্ছা অটুট রেখে কাটিয়ে দিতে পারি সে উদ্দেশ্যে সকলের দোয়া ও শুভ কামনা প্রার্থী।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে অনেক দিয়েছেন। কোন আশা-ই অপূর্ণ রাখেন নি, প্রতিবেলা নামাজে কৃতজ্ঞতা জানাই; তবুও নিস্কৃতি পাব কিনা তা "মালিক-ই" জানেন। একান্ত আশা এবং অকুল ফরিয়াদ ঈমানে অটুট এবং দৃঢ় থেকে কালেমা মুখে নিয়ে যেন মৃত্যুটা হয়।

উপদেশাবলী

উমেদ উল্লাহ্ খান

- প্রকৃতির প্রথম এবং প্রধান আইন হচ্ছে পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা।
- পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য যেরূপ, বড় ভাইয়ের প্রতি ছোট ভাইয়ের কর্তব্যও তদ্রূপ।
- মানুষের জীবনে সফলতা ও সার্থকতার পথে অনেক অনেক বাধা, সহস্র বাধার মুখে অটল থেকে যারা স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয় তারাই সত্যিকারের মানুষ, মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য জয়ের মালা ও সাফল্যের মুকূট আলাদা করে রেখেছেন।
- সকল সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ধৈর্য্য ও চেষ্টা।
- অন্যায় কিছু করে উপরে উঠার চেষ্টা করবেন না, যদি করেন তাহলে আপনার অতীত আপনাকে পাক্ড়াও করবে।
- রাত্রে ঘুমুবার আগে আপনার সারাদিনের কাজ কর্ম নিয়ে আপনার বিবেককে একবার প্রশ্ন করুন।
- মানুষের চরিত্র সৎ এবং সুন্দর হলে তার কথাবার্তাও নম্র এবং ভদ্র হয়।
- প্রমাণ না পেয়ে কাকেও দোষারূপ করবেন না।
- মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে যা বলে তা হালকা ভাবে গ্রহণ করবেন।
- সংসারে কারো উপর ভরসা করবেন না, নিজের হাত ও পায়ের উপর ভরসা করুন।
- কোন কাজের দায়িত্ব নেবার আগে, কোন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেবেন।
- আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি যে একমাত্র ভালবাসা ও সততার দ্বারা দুনিয়াকে জয় করা যায়।
- যে অর্থ মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় না, যে ক্ষমতা মানুষের দাবী রক্ষার্থে অর্জিত হয় না, যে বিদ্যা মানুষকে সত্য ও ন্যায় শুনাবার জন্য লাভ হয়নি, সেই অর্থ, সেই ক্ষমতা ও সেই বিদ্যার কোন মূল্য নেই।
- ভাল লোকের সঙ্গে থাকুন, বুদ্ধি না থাকলেও তারা ভাল পরামর্শ দেবেন।

- ভদ্রতা উন্নত চরিত্রের লক্ষন।
- মানুষ বলে, এটা আমার ঘর; ওটা আমার ঘর, কিন্তু হে মানুষ, তোমার ঘরেই তুমি অতিথি।
- বেদনা পাপের শাস্তি।
- কথা বলার সময় কথা গুছিয়ে বলবেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বিরক্তির উদ্রেক করে।
- নিজের কথা ভেবে অন্যের বিচার করুন।
- যে নিজে সতর্কতা অবলম্বন করেনা, দেহরক্ষী তাকে বাঁচাতে পারে না।
- আমি "যা", তার জন্য ঘৃণিত হতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যা নই, তার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ হতে চাই না।
- বেশী কথা বলা, তা যতই মূল্যবান হউক, নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।
- জীবনে যে কখন কার সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলা যায় না, তাই জীবনে কাকেও ঘৃণা করবেন না, হিংসা ও অবহেলা করবেন না।
- আমার সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমার জন্মটা যেন আমার মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে না যায়।
- শৃগালের মত একশত বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মত একদিন বাঁচাও ভাল।
- মিষ্টি কথায় আদেশ প্রদানের মধ্যে প্রবল শক্তি নিহিত থাকে।
- বিপদের মধ্যে যার বুদ্ধি লোপ পায়না সে সত্যিকারে মানুষ।
- যে লোক প্রতিবেশীর কাছে উত্তম সে আল্লাহর কাছেও উত্তম।
- যা পেয়েছেন তা যদি কম মনে করা হয়, তাহলে সারা পৃথিবীটা দিলেও দুঃখ ঘুচবে না।
- শত্রুর কাছে যে কথা গোপন করবেন, বন্ধুর কাছেও তা গোপন করবেন।
- তিনটা জিনিষ পবিত্র রাখুন- শরীর, পোষাক ও আমানত।
- দুঃখকে আজ যতটা পাষান মনে হবে, আগামি কাল তত মনে হবে না এবং অচিরেই তা মিলিয়ে যাবে।
- বন্ধু অপেক্ষা শত্রুকে পাহারা দেয়া সহজ।
- রাজাই হউক আর চাষীই হউক, সেই সুখী, যে গৃহে শান্তি পায়।

- যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে, সে যেন বেহেস্তের ফুল তুলতে থাকেন।
- নির্দয় হয়োনা, কিন্তু কর্তব্য কাজে নির্মমও হতে হবে।
- বিজ্ঞলোক সুযোগ তৈরী করে, সুযোগের অপেক্ষা করে না।
- মেজাজ ঠান্ডা রাখুন তাহলে সবাইকে ঠান্ডা রাখতে পারবেন।
- ধার করা কাপড়ে শীত কাটেনা।
- জীবনে কি পেলাম সেটা বড় প্রশ্ন নয়, জীবনে কি করেছি সেটাই বড় প্রশ্ন।
- কর্মজীবি মানুষের ঘরে ক্ষুধা উঁকি মারে কিন্তু ঢুকতে সাহস করেনা।
- ভাল কথা, তা খারাপ লোকে বললেও গ্রহণ করুন।
- আত্মগর্ব এমন একটা জঘন্য পাপ যা সত্তর বছরের নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়।
- আল্লাহ তাআলার কাছে সে লোকটা নিকৃষ্ট, যে সব সময় মামলা-মোকাদ্দমা নিয়ে থাকে।
- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত, পাপ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।
- কৃতজ্ঞ হৃদয়ের চেয়ে সম্মানজনক জিনিষ আর কিছুই নাই।
- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শত ব্যস্ততার মধ্যেও একটু চিন্তা করুন, একটু ভাবুন, তার পর কাজ করুন।
- আমি তাকে স্বর্ণ, মণিমুক্তা, হীরা ইত্যাদি উপহার দেইনি, আমি তাকে এর চেয়েও অনেক অনেক মূল্যবান জিনিষ দিয়েছি সেটা হলো-'বই'।
- কথা বলার সময় গুছিয়ে বলবেন, অসংলগ্ন কথা বিরক্তির উদ্রেক করে।
- আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। আগামিকাল সময় ও সুযোগ নাও হতে পারে।
- শিক্ষিত বোকারা অশিক্ষিত বোকার চেয়ে বেশী বোকা।
- অন্ধকারের মধ্যে যার বলিষ্ট হাত তোমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে, সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু।
- সূর্য যেমন বরফকে গলিয়ে দেয়, সদব্যবহারও তেমনি গুনাহ্ সমূহকে গলিয়ে দেয়।
- তোমরা যা খাও অধীনস্থদেরকেও তা খেতে দাও।
- বিধাতার পছন্দনীয় জিনিষ হলো মানুষ হয়ে মানুষের জন্য কিছু করা।

চুনতি গ্রাম

উমেদ উল্লাহ্ খান

পাহাড় ঘেরা ছায়া ঢাকা নিঝুম নিথর গ্রাম,
পাখীর ডাকে মুখরিত চুনতি তার নাম।
ডাকছে কোকিল বনে বনে বন পাপিয়ার মধুরতান
পাখীর গানে সবুজ বনে উদাস করে মন।
সহজ সরল লোকগুলো সব দয়ায় মায়ায় ভরা প্রাণ
ঝগড়া বিবাদ নেইকো সেথায় সবাই আপন জন।
লাল টুক্‌টুকে পাহাড় পর্বত টিলার উপর ঘর
অনেকে থাকছে সেথায় সারা জীবন ভর।
পীর দরবেশ আওলীয়ারা মোদের গ্রামে ছিলেন যারা
পাহাড় দেশে ঘুমিয়ে আছেন গভীর নিদ্রায় তাঁরা
শিক্ষা-দীক্ষায় আর ধর্মীয় কাজে এই গ্রাম শীর্ষস্থানে
উন্নত এই গ্রামটিরে দেশ বিদেশে সবাই চিনে।
চুনতির স্বনামধন্য আল্লার ওলী শাহ সাহেব হাফেজ আহমদ নাম
আল্লাহ্‌র ধ্যানে মত্ত থাকা তাঁর ছিল প্রধান কাম
রবিউল আওয়াল মাসে যখন সিরাতুন্নবীর জলসা হয়
দেশ-বিদেশের লাখ লোক সেথায় এসে হাজির হয়।
স্কুল কলেজ সবই আছে অভাব কিছুই নেই
লেখাপড়া করছে সবাই স্কুল কলেজে যাই।
মেয়েদের আছে আলাদা কলেজ আলাদা মাদ্‌রাসা
ছাত্রীরা যাচ্ছে সেথায় করছে যাওয়া আসা
প্রখ্যাত এক মাদ্‌রাসা আছে, হাকিমিঞা মাদ্‌রাসা
এটাই মোদের নয়ন মণি, মোদের আশা ভরসা
দু'হাত তুলে দোয়া মাগি হে খোদা দয়াময়
ভবিষ্যতে মোদের দেশের আরো যেন উন্নতী হয়।

সমাপ্ত